ফেলুদা সমগ্র

শকুন্তলার কণ্ঠহার

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল 2
২. লাঞ্চ খাব প্রতাপগড়ে............................ 9
৩. তিন দিন হল লখ্নৌতে এসেছি.................... 13
৪. ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম 21
৫. পুলিশ সার্চ করে কিছু পায়নি 30
৬. হজরতগঞ্জে সালডানহা অ্যান্ড কোম্পানি 42
৭. দিলখুশা 51
৮. ভুরু ভীষণ কুঁচকে গেছে........................ 57
৯. অর্ধেক মামলার সমাধান......................... 60

১. শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল

শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল। ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে বলছেন, মশাই, সেই সোনার কেল্লার অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে রইচ, কিন্তু তার আগে লখ্নৌ আর গ্যাংটকে আপনাদের যে দুটো অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে তখন তো আর আমি ছিলাম না। কাজেই সে দুটো জায়গাও আমার দেখা হয়নি। বিশেষ করে লখ্নৌ-এর মতো একটা ঐতিহাসিক শহর। আপনারা তো গেছেন সেই কবে, চলুন না। এবার পুজোয় আরেকবার যাওয়া যাক।

ফেলুদার লখ্নৌ ভীষণ ভাল লাগে জানি, আর সেই সঙ্গে আমারও। আইডিয়াটা মন্দ না। প্রথমবার যখন যাই, আর আমাদের বাদশাহী আংটির অ্যাডভেঞ্চারটা হয়, তখন আমি খুব ছাট। এখন গেলে লখ্নৌ আরও ভাল লাগবে সেটা আমি জানি।

ফেলুদা বলল, আমারও লখ্নৌ-এর কথা হলেই মনটা চনমান করে ওঠে। আর অত সুন্দর শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। এ রকম কটা জায়গা পাবেন আপনি? ব্রিজের একদিকে শহরের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক অন্য দিকে। তা ছাড়া নবাবি আমলের গন্ধটা এখনও যায়নি। চারিদিকে তাদের কীর্তির চিহ্ন ছড়ানো। তার উপর সেপাই বিদ্রোহের চিহ্ন। নাঃ-আপনার কথাই শিরোধার্য। ক'দিন থেকে ভাবছি কোথায় যাওয়া যায় এবার পূজোয়। লখ্নৌই চলুন।

ফেলুদা আজকাল ভাল রোজগার করে। প্রাইভেট গোয়েন্দাদের মধ্যে ওর নামডাকই সবচেয়ে বেশি। মাসে অন্তত সাত-আটাটা কেস আসে, আর প্রতি তদন্তের জন্য দু হাজার করে পায়। অবিশ্যি রোজগারের দিক দিয়ে লালমোহনবাবুকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল। একবার বলেছিলেন ওঁর বইয়ের থেকে বার্ষিক আয় নাকি প্রায় তিন লাখ টাকা। তার উপরে নতুন নতুন বই প্রতি বছরই বেরোচ্ছে।

আমরা আর দ্বিধা না করে লখ্‌নৌ যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। দুন এক্সপ্রেসে তিনটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট-রাত নষ্টায় বেরোনো, পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পৌঁছানো। সেই সঙ্গে অবিশ্যি হোটেল বুকিংও টেলিগ্রাম করে ফেলা হল! ফেলুদা বলল, যাবই যখন তখন আরামে থাকব, নইলে ক্লান্তি যাবে না।

কোন হোটেলে উঠবেন? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

হোটেল ক্লার্কস- আওয়ধ।

আওয়ধ? আওয়ধ ব্যাপারটা কী?

আওয়ধ হল অযোধ্যার উর্দু নাম।

লখ্‌নৌ বুঝি অযোধ্যায়?

সেটাও জানেন না? লখ্‌নৌ নামটাও এসেছে লক্ষ্মণ থেকে।

রামের ভাই লক্ষ্মণ?

ইয়েস স্যার। আওয়ধ হল। লখ্‌নৌ-এর সেরা হোটেল। একেবারে গুমতীর উপরে। হোটেলের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে।

বাঃ—আইডিয়াল। আওয়ধ অন দি গুম্‌তী। ঠাণ্ডা কেমন হবে?

সন্ধের জন্য একটা পুলোভার নিয়ে নেবেন। অথবা আপনার গরম জহর কোিট। আপনি সাহেব সাজবেন না বাঙালি সাজবেন তার উপর নির্ভর করছে।

দুটোই নেব।

ভেরি গুড।

ওখানে তো বাঙালি অনেক?

বিস্তর। ছ-সাত পুরুষ থেকে লখ্‌নৌতে প্রবাসী এমন বাঙালিও আছে। বেঙ্গলি ক্লাব আছে–সেখানে পুজো হয়। বলা যায় না-আপনার অনুরাগী পাঠকও সেখানে কিছু পেয়ে যেতে পারেন।

তা হলে আমার লেটেস্ট বই সাংঘাইয়ে সংঘাত। কয়েক কপি সঙ্গে নিলে বোধহয় মন্দ হয় না।

কয়েক কপি কেন—এক ডজন নিয়ে নিন।

৫ই অক্টোবর শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে প্রচুর ভিড়। রিজার্ভেশন ক্লার্ক দেখলাম ফেলুদাকে দেখে চিনলেন—বললেন, চলুন স্যার, আপনাদের বোগি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা ফোর্থ-বার্থ কম্পার্টমেন্টে তিনটে বার্থ-এই তো? এই যে আপনাদের বোগি। তিন নম্বর কামরা আপনাদের জায়গা-একটা লোয়ার, দুটো আপার বার্থ।

আমরা গিয়ে আমাদের জায়গা দখল করলাম। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে এসেছি, তাই ট্রেনে খাবার ঝামেলা নেই। একটা লোয়ার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক বসে আছেন, বছর পঞ্চাশ বয়স, মাঝারি হাইট, ঠোঁটের উপর একটা সরু গোঁফ। আমাদের দেখে একটু সরে বসে পাশে জায়গা করে দিলেন। ফেলুদা সেখানে বসল, আমরা দুজন উলটা দিকের বার্থে। দশ দিন থাকব। আমরা লখ্‌নৌ। মালপত্র বেশি নিইনি; আমার আর ফেলুদার জিনিস একটা বড় সুটকেসে আর লালমোহনবাবুর জিনিস তাঁর বিখ্যাত লাল জাপানি সুটকেসে। বলেন। ওটা নাকি ওঁর পাড়ার এক ধনী ব্যবসাদার বন্ধু হৃষীকেশ চৌধুরী জাপান থেকে স্পেশালি লালমোহনবাবুর জন্য এনে দিয়েছেন।

আমাদের সহযাত্রীটি বাঙালি কি না সে বিষয় একটু সন্দেহ ছিল। সেটা দূর হল ভদ্রলোক যখন নিজে আলাপ করলেন।

আপনারা কদ্দুর যাবেন? জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

লখ্‌নৌ, বললেন লালমোহনবাবু। আপনি?

আমিও লখ্‌নৌ যাচ্ছি। ওখানেই থাকি। আমরা তিন পুরুষ ধরে ওখানেই আছি। আপনারা কি বেড়াতে যাচ্ছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন লালমোহনবাবু।

এবার ফেলুদা বলল, আপনার সুটকেসে দেখছি তিনটি ইংরেজি হরফ লেখা রয়েছে- এইচ. জে. বি.। এরকম অদ্ভুত ইনিশিয়ালস তো বড় একটা দেখা যায় না। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করলে আশা করি আপনি বিরক্ত হবেন না।

মোটেই না। আমার নাম জয়ন্ত বিশ্বাস। এইচ-টা হল হেক্টর। আমি ক্রিশ্চান। আমাদের পরিবারের সকলেরই একটা করে ক্রিশ্চান নাম আছে।

ধন্যবাদ, বলল ফেলুদা। আপনার নামটা যখন বললেন তখন আমাদের নামও বলা সমীচীন। আমি প্রদোষ মিত্র, এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি আমাদের বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী।

ভদ্রলোক বললেন, আমার শাশুড়ির নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। উনি সাইলেন্ট যুগে ফিল্মে অ্যাকটিং করতেন। খুব পপুলার ছিলেন।

কী নাম বলুন তো? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

শকুন্তলা দেবী।

আরেব্বাস, বললেন লালমোহনবাবু, তিনি তো যাকে বলে তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত স্টার। আমার এক প্রতিবেশী আছেন, নরেশ বোস—এখন বয়স হয়েছে, তবে যুবা বয়সে তিনি ফিল্মের পোকা ছিলেন। তাঁর কাছে বাঁধানো বায়োস্কোপ পত্রিকা দেখেছি।

তাতে শকুন্তলা দেবীর বিস্তর ছবি রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে লেখাও রয়েছে অনেক। তিনি বোধহয় বাঙালি ছিলেন না।

না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে পারেন। আসল নাম ছিল ভার্জিনিয়া রেনল্ডস। তাঁর বাবা টমাস রেনল্ডস ছিলেন আর্মিতে। তিনি লখ্নৌতেই পোস্টেড ছিলেন। চোস্ত উর্দু বলতে পারতেন। তিনি একজন মুসলমান বাঈজিকে বিয়ে করেন। তাঁরই মেয়ে হলেন ভার্জিনিয়া।

হাইলি ইন্টারেস্টিং, বললেন লালমোহনবাবু। কিন্তু তিনি তো বোধহয় টকিতে অভিনয় করেননি।

না। এদেশে টকি আসার আগেই তিনি বিয়ে করে ফেলেন একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে। তারপর প্রথম সন্তান হবার পরই শকুন্তলা দেবী ছবির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম দুটি সন্তান ছিল মেয়ে, তৃতীয়টি ছেলে। আমি দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করি। ১৯৬০-এ। আমার বড় শালি বিয়ে করেন একটি গোয়ানকে। আমার ছোট শালা বিয়ে করেননি।

এতদিন লখ্নৌতে থাকবার জন্যই বোধহয় ভদ্রলোকের বাংলায় একটা পশ্চিমা টান এসে গেছে। যদিও ভাষায় কোনও গণ্ডগোল নেই।

এবার ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

কোনও এক মহারাজা শকুন্তলা দেবীকে একটা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তাই না?

আপনি ঠিকই বলেছেন, বললেন জয়ন্তবাবু। মাইসোরের মহারাজা! শকুন্তলার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার দেন। তখনকার দিনেই দাম ছিল। লাখ খানেকের মতো। কিন্তু এটা আপনি কী করে জানলেন? যদ্দুর মনে হয় শকুন্তলা অভিনয় করতেন। আপনার জন্মের আগে।

তা তো বটেই, বলল ফেলুদা। কিন্তু বছর পনেরো আগে আমি খবরের কাগজে একটা খবর পড়ি। এই হার চুরি হয়েছিল, তারপর পুলিশ সেটা উদ্ধার করে।

ঠিক কথা। তখনও শকুন্তলা দেবী বেঁচে। তিনি মারা গেছেন তিন বছর আগে আটাত্তর বছর বয়সে। মারা যাবার পরেও এই হারটার কথা কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু আপনার সেই পনেরো বছর আগের খবরের কথা মনে আছে–আপনার মেমরি তো খুব শার্প দেখছি।

ক্রাইমের খবর আমি বহুদিন থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে পড়ি। আর পড়লে আমার মনেও থাকে। আসল কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি। আমার পেশাটিও হচ্ছে ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত।

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে জয়ন্তবাবুর হাতে দিল। ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল।

প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! তাই বলুন। আপনার নামটা চেনা চেনা লাগিছিল। আপনার তো একটা ডাকনামও আছে।

হ্যাঁ। ফেলু।

ফেলু। ইয়েস-ফেলুদা! আমার মেয়ে আপনার বিশেষ ভক্ত। আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তার পড়া। বাংলা সে এমনিতে একেবারেই পড়ে না, কিন্তু আপনার বইগুলো পড়ে। যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।

এবার ফেলুদা লালমোহনবাবুর পরিচয়টাও দিয়ে দিল। বলল, এঁর নাম লখ্নৌ অবধি পৌঁছেছে কি না জানি না, তবে ইনি বাংলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় থ্রিলার রাইটার। জটায়ু ছদ্মনামে এর উপন্যাস বেরোয়।

বাঃ দুজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়ে গেল এ তো আশ্চর্য ব্যাপার। লখ্নৌতে আপনারা উঠছেন কোথায়?

ক্লার্কস- আওয়ধ।

আমি থাকি নদীর ওদিকে–বাদশাবাগে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। একদিন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে হবে আপনাদের। আমার স্ত্রী খুব ভাল মোগলাই রান্না রাঁধেন। তা ছাড়া আমার মেয়ে তো ফেলুদাকে দেখে থ্রিলাড হয়ে যাবে। আপনাদের তিনজনেরই আসা চাই কিন্তু।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলল ফেলুদা। আর সেই সঙ্গে আশা করি বিখ্যাত কণ্ঠহারটাও একবার দেখা যাবে।

সে তো খুব সহজ ব্যাপার। কারণ হারটা আমার কাছেই আছে। অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কাছে।

কেন? ছোট মেয়ের কাছে কেন? বড় মেয়ের কাছে নয় কেন?

কারণ ভার্জিনিয়ার তাঁর ছোট মেয়ের উপর বেশি টান ছিল। আর অনেক গুণ ছিল এই ছাট মেয়ের–অর্থাৎ আমার স্ত্রী সুনীলার। অবিশ্যি সে সব গুণের সদ্ব্যবহার সে করেনি। বিয়ের পর পুরো গৃহিণী বনে গিয়েছিল। বিয়ে না করলে হয়তো ফিল্মে চান্স নিত, কারণ তার অভিনয় দক্ষতা ছিল যথেষ্ট।

আপনার স্ত্রীর নাম সুনীলা বললেন। ওঁনার কোনও ক্রিশ্চন নাম নেই?

হ্যাঁ। ওর পুরো নাম প্যামেলা সুনীলা।

২. লাঞ্চ খাব প্রতাপগড়ে

রাত্রে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাড়ে ছটায় উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে বক্সারে ব্রেকফাস্ট খেলাম। মোগলসরাই আসবে পৌনে নটায়। লাঞ্চ খাব প্রতাপগড়ে সাড়ে বারোটার সময়।

জয়ন্তবাবু দেখলাম খুব সকালেই ওঠেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বললেন, কাছেই কুপেতে আমার এক চেনা ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

লালমোহনবাবুও স্নানটান করে দাড়ি কামিয়ে একেবারে ফিটফট। উনি বিক রেজার দিয়ে দাড়ি কামান। এগুলো বার তিন-চার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। কলকাতায় পাওয়া যায় না। লালমোহনবাবুর এক বন্ধু কাঠমাণ্ডু থেকে ওঁর জন্য চার প্যাকেট অর্থাৎ কুড়িটা এনে দিয়েছেন। বললেন, ভারী আরামে শেভ করা যায় মশাই।

ফেলুদা বলল, দু মাস পরে তো আবার দিশি ব্রেডে ফিরে যেতে হবে।

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, নো স্যার। দাড়ি কামানার ব্যাপারে আমি একটু লাক্সারি পছন্দ করি। আমি নিউ মার্কেট থেকে উইলকিনসন ব্লেড কিনি।

সে তো অনেক দাম।

সংসার করিনি, টাকা কার জন্যে জমাব বলুন তো? তাই নিজের পেছনেই খরচ করি।

আমাদের পেছনেও কম খরচ হয় না আপনার। আপনার গাড়ি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি।

মশাই, তিনজনের একজন মাস্কেটিয়ারের গাড়ি আর দুজন চড়বে না—এ কেউ শুনেছে কখনও?

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বাইরের প্যাসেজে পায়চারি করতে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, এক নম্বর কুপেতে জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীর সঙ্গে দিব্যি গপ্পে মেতে আছেন। ইংরিজিতে কথা হচ্ছে, অর্থাৎ ভদ্রলোক অবাঙালি। দেখে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে মনে হল, যদিও রং আমাদেরই মতো।

কী কথা হচ্ছে শুনতে পেলেন নাকি? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

আলাপী বললেন, আই গিভ ইউ জাস্ট থ্রি ডেজ। এর বেশি আর কিছু শুনিনি।

কথাটা কি হুমকি বলে মনে হল?

ট্রেনের শব্দের জন্য গলা তুলতে হয় বলে সব কথাই হুমকির মতো শোনায়।

একটু পরেই জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ফেলুদাকে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দিস ইজ মিঃ সুকিয়াস–এ ওয়েলনান বিজনেসম্যান অফ লাকনাউ। তা ছাড়া আর্টের সমঝদারও বটে।

সুকিয়াস ইংরেজিতে বললেন, আশা করি আমাদের আবার লখ্নৌতে দেখা হবে। মিঃ বিসওয়াস আমার অনেকদিনের পুরনো বন্ধু।

সুকিয়াস চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু তাঁর বার্থের আধখানা দখল করে বসলেন। বাকি আধখানায় যথারীতি ফেলুদা বসেছে।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, আপনার শাশুড়ির আসল নাম বলছিলেন ভার্জিনিয়া রেনল্ডস। এই রেনল্ডস পরিবার কবে থেকে আছে ভারতবর্ষে?

জয়ন্তবাবু বললেন, ভার্জিনিয়ার ঠাকুরদাদা জন রেনল্ডস ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৮৫৭-র সেপাই বিদ্রোহের সময় তিনি লখ্নৌতে পোস্টেড ছিলেন। যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়ে

একেবারে শেষদিকে সেপাইদের কামানের গোলায় প্রাণ দেন। তাঁর ছেলে টমাসও বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। তিনি উর্দু শিখে একদম ভারতীয় বনে গিয়েছিলেন। রাজার হালে থাকতেন। নিজের বাড়িতে রেগুলার বাঈনচের আয়োজন করতেন। ফরাসিতে তামাক খেতেন, পান খেতেন, আতর মাখতেন। এমনকী মাঝে মাঝে দিশি পোশাকও পরতেন। অবশেষে তিনি ফরিদা বেগম নামে এক কথক নাচিয়েকে ভালবেসে ফেলে তাকে বিয়ে করেন। বাড়িতে মুলসমান কেতা চালু ছিল। লোকে টমাসকে বলত টমাস বাহাদুর। টমাসের প্রথমে দুটি ছেলে হয়, নাম এডওয়ার্ড আর চার্লস। এরাও ছেলেবেলা থেকেই উর্দু বলত। এরা কেউই আমিতে যোগ দেয়নি। এডওয়ার্ড উকিল হয়, আর চার্লস আসামের চা-বাগানে ম্যানেজারি করতে চলে যায়। সে আর লখ্‌নৌতে ফেরেনি। টমাসের তৃতীয় সন্তান অবশ্য ছিল ভার্জিনিয়া। উনি ছেলেবেলা থেকেই উর্দু আর ইংরেজি একসঙ্গে শিখেছিলেন। গায়ের রংটা ছিল সাহেবের মতো ফরসা, কিন্তু চুল আর চোখ ছিল কালো। তাই যখন ছবিতে দিশি চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁকে বেমানান লাগত না।

আগেই বলেছি ভার্জিনিয়া একজন বাঙালি ক্রিশচীনকে বিয়ে করেন। এর নাম ছিল পার্সিভ্যাল মতিলাল ব্যানার্জি। আসলে ইনি ছিলেন শকুন্তলার ছবির প্রোডিউসার। ইনিই আমার শাশুড়িকে ছবিতে নামান। স্ত্রীর ছবি থেকে উনি অনেক টাকা করেন। সত্যি বলতে কী, ভার্জিনিয়ার বাবা টমাস নবাবি করে শেষ জীবনে বেশ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। তখন ভার্জিনিয়া তাঁর ফিল্মের রোজগার থেকে বাবাকে সাহায্য করেন।

পার্সিভাল আর ভার্জিনিয়ার তিনটি সন্তান জন্মায়। বড় এবং মেজো হল মেয়ে, ছোটটি ছেলে। বড়টির নাম মার্গারেট সুশীলা। ইনি যে একজন গোয়ার অধিবাসীকে বিয়ে করেন। সে কথা আগেই বলেছি। এঁর নাম স্যামুয়েল সালডানাহা। এনার একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান রয়েছে।

দ্বিতীয়া মেয়ে প্যামেলা সুনীলাকে আমি বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। আমার মেয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আমার একটি ছেলেও আছে। তার নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। মেয়েটির নাম মেরি শীলা। ছেলেটিকে

আমার আপিসে ঢোকাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে নিজের পথে নিজের মর্জিমতো চলে। শীলা দুবছর হল ইজাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে বি এ পাশ করেছে। ভাল অভিনয় করতে পারে-বাংলা ইংরেজি দুইই। তবে ওর আসল ইন্টারেস্ট হল জার্নালিজমে। দু-একটা ইংরেজি লেখা কাগজে বেরিয়েছে—বেশ ভাল লেখা।

ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরালেন। লালমোহনবাবু যে সিগারেট খান না সেটা উনি জানেন।

ফেলুদা বলল, অদ্ভুত ইতিহাস।

হাইলি রোম্যান্টিক, বললেন লালমোহনবাবু।

শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহারটা কি আপনার স্ত্রী কখনও পরেছেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

দু-একটা পার্টিতে পরেছেন। তবে সচরাচর ওটা সিন্দুকেই তোলা থাকে। দেখলে বুঝবেন জিনিসটার কী মহিমা।

আমি তো না দেখে থাকতে পারছি না, বললেন লালমোহনবাবু।

আর দিন চারেক ধৈর্য ধরুন, বললেন জয়ন্তবাবু।

৩. তিন দিন হল লখ্‌নৌতে এসেছি

আমরা তিন দিন হল লখ্‌নৌতে এসেছি। প্রথমবারের কথা বার বার মনে পড়ছে। সেই বাদশাহী আংটি, মিঃ শ্রীবাস্তব, বনবিহারীবাবুর আশ্চর্য চিড়িয়াখানা, হরিদ্বার, আর লছমনঝুলার পথে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের শিহরুন-জাগানো ক্লাইম্যাকস।

সেবার অবিশ্যি আমরা হোটেলে থাকিনি। খুব সম্ভবত ক্লার্কস-আওয়ধ হোটেল তখনও তৈরিই হয়নি। হোটেলটা সত্যিই ভাল। আমরা পাশাপাশি একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুমে আছি। দুঘরের জানালা দিয়েই গুমতী নদী দেখা যায়। নদীর ওপারে পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায়, সে দৃশ্য দেখবার মতো! হোটেলের খাওয়াও দুর্দান্ত ভাল। আমরা অনেক জায়গায় অনেক হোটেলে থেকেছি, কিন্তু এত ভাল খাওয়া কোনও হোটেলে খাইনি।

এই তিন দিনে লালমোহনবাবু লখ্‌নৌ-এর প্রায় বেশির ভাগ দ্রষ্টব্যই দেখে নিয়েছেন। আমরা প্রথম গোলাম বড়া ইমামবাড়ায়। এর থাম-ছাড়া বিশাল হলঘর দেখে এবারও মাথা ঘুরে গেল। লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না, শুধু একবার বললেন, ব্রাভো নওয়াবস অফ লখ্‌নৌ।

তারপর ভুলভুলাইয়া দেখে ভদ্রলোকের ভির্মি খাবার জোগাড়। এই গোলোকধাঁধায় নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকেচুরি খেলতেন শুনে ওঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

আরও চমক এল রেসিডেন্সিতে। এ যে ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠছে মশাই। গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি, বারুদের গন্ধ পাচ্ছি। সেপাইদের এত এলেম ছিল যে এরকম একটা বিল্ডিংকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল?

চতুর্থ দিনে সকালে একটু বাজারে গিয়েছিলাম। এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি ভুনা পেড়া কিনতে, হোটেলে ফিরে এসে দেখি ঘরে ছাপানো নেমন্তন্ন চিঠি রয়েছে। পাঠিয়েছেন হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস। আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ পরশু, তাঁদের বিয়ের রৌপ্য জয়ন্তী

উপলক্ষে মিঃ অ্যান্ড মিসেস বিশ্বাস আমাদের ডিনারে ডেকেছেন। নেমন্তন্ন চিঠির সঙ্গে একটু আলাদা কাগজে রাস্তার প্ল্যান আর কোনখানে বাড়ি সেটা ছাপা রয়েছে। বাড়িটা যে নদীর ওদিকে সেটা ভদ্রলোক আগেই বলেছিলেন। প্ল্যান দেখে বাড়ি খুঁজে বার করায় কোনওই অসুবিধা হবার কথা নয়।

বলল ভদ্রলোক বলে দিলেন যেন আমরা অবশ্যই যাই। ওখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, তা ছাড়া শকুন্তলার হারটাও দেখা যাবে। ফেলুদা আরও বলল যে ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন যে একেবারে ইনফরম্যাল ব্যাপার, কোনও বিশেষ পোশাক পরিবার দরকার নেই।

এইটেই আমার ভয় ছিল, বলল ফেলুদা। নেমন্তন্নে আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্য যদি সাহেব কিংবা বাবু সাজতে হয় তা হলেই গোলমাল।

আমাদের হাতে একদিন সময় ছিল, তার মধ্যে ছোটা ইমামবাড়া, ছত্তর মঞ্জিল আর চিড়িয়াখানা দেখে নিলাম। খাঁচার বাইরে বাঘ সিংহ দেখে লালমোহনবাবু ভয়ানক ইমপ্রেস্‌ড। বললেন কলকাতাতে এরকম হওয়া উচিত।

শুক্রবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা পৌনে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। প্ল্যান দেখে বাড়ি বার করতে কোনও অসুবিধা হল না। একতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে বেশ বড় ফুলের বাগান। তার মধ্য দিয়ে নুড়ি ঢালা পথ চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। আমরা দরজায় বেল টিপলাম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একজন উর্দি পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল। বাড়ির ভিতর থেকে লোকজনের গলার শব্দ পাচ্ছিলাম, বেয়ারা ভিতরে গিয়ে বলতেই জয়ন্তবাবু চটপট বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

আসুন, আসুন, মিঃ মিত্র, আই অ্যাম সো গ্র্যাড় ইউ হ্যাভ কাম।

আমরা তিনজন জয়ন্তবাবুর পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম পাঁচ-সাত জনের বেশি লোক নেই। হয়তো পরে আরও আসবে।

এর পর আলাপ পর্ব। প্রথমে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। দেখে বুঝলাম মহিলা এককালে সুন্দরী ছিলেন। তারপর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। মেয়েটি-নাম মেরি শীলা দেখতে সুশ্রী। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপা; ছেলেটির একেবারে পার্ক স্ট্রিট মাক চেহারা–দাড়ি, গোঁফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তাতে চিরুনি পড়েনি। এরই নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। তারপর জয়ন্তবাবু বললেন, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সালডানহা। অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর বড় শালি এবং তাঁর স্বামী। ভদ্রমহিলা মোটা হয়ে গেছেন, ভদ্রলোক আবার তেমনই রোগা, দাড়ি গোঁফ কামানো, ষাটের কাছাকাছি বয়স। এই সালড়ান্হারই বাজনার দোকান আছে-ইনি গোয়ার অধিবাসী। আপাতত এই কজনই রয়েছেন ঘরে।

ঘরটা বেশ বড়, আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল দেখে যে ঘরের একদিকে একটা সিনেমা স্ক্রিন টাঙানো রয়েছে আর অন্যদিকে রয়েছে একটা প্রোজেক্টর। জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন ওঁদের কাছে শকুন্তলা দেবীর শেষ ছবির একটা প্রিন্ট আছে, সেটার একটা রিল নাকি ডিনারের আগে দেখানো হবে। এই ছবিতে নাকি শকুন্তলা দেবী তাঁর বিখ্যাত হারটা পরেছিলেন। গল্পটা কপালকুণ্ডলা, আর শকুন্তলা দেবী সেজেছিলেন লুতফ-উন্নিসা। আমার তো শুনেই মনটা চনমান করে উঠল।

ফেলুদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। মেরি শীলা এসে বলল, আমি আপনার একজন ভীষণ অ্যাডমায়ারার। দুঃখের বিষয় আমার কোনও অটোগ্রাফ খাতা নেই। আমি আজিকালের মধ্যেই একটা খাতা কিনে নিয়ে আপনার হোটেলে গিয়ে সই নিয়ে আসব।

বাংলার মধ্যে অনেকগুলো ইংরিজি কথা ব্যবহার করছিল শীলা। সেটা এখানে প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ করছিলাম।

বেয়ারা পানীয় পরিবেশন করছিল। আমরা তো মদ খাই না, তাই তিনজনে তিন গেলাস ফলের সরবত নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলাম! স্যামুয়েল সালডানহা আমাদের দিকে

এগিয়ে এসে বললেন, হজরতগঞ্জে আমাদের মিউজিক শাপ। একদিন দোকানে এলে আমি খুব খুশি হব।

আপনার দোকানে দিশি যন্ত্রও বিক্রি হয়? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমরা এখন সেতারাও রাখছি, বললেন ভদ্রলোক।

এবার একজন ভদ্রলোক এলেন তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি জয়ন্তবাবুর শালা, কারণ তাঁর চেহারার সঙ্গে সুশীলা দেবীর খুব সাদৃশ্য। ইনি প্রায় সাহেবের মতোই দেখতে, কারণ এর চুল আর চোখও কটা।

ইনি একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আমার নাম রতনলাল ব্যানার্জি। আমি জয়ন্তর ব্রাদার-ইন-ল। আপনাদের পরিচয়...?

এই সময় জয়ন্তবাবু এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ? রতনলাল ভুরু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কি কোনও কেসের ব্যাপারে লখ্‌নৌতে এসেছেন?

ফেলুদা হেসে বলে, না, স্রেফ ছুটি।

এই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বৃদ্ধই বলা চলে। সম্ভবত স্বাটের্স্ক উপর বয়স নিশ্চয়ই। বুঝলাম। তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা কী রকম যেন অপরিচ্ছন্ন। এই পার্টিতে তাঁকে মানাচ্ছে না। পোশাক অপরিষ্কার, দাড়িও অন্তত দুদিন কামাননি, মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে।

জয়ন্তবাবু ভদ্রলোকের পিঠে হাত দিয়ে আমাদের দিকে নিয়ে এলেন।

আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, বললেন জয়ন্তবাবু। জানা গেল ইনি হচ্ছেন একজন চিত্রশিল্পী। নাম সুদর্শন সোম। এককালে খুব নাম করা পোর্ট্রেট পেন্টার ছিলেন, শকুন্তলা

দেবীর অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন। এখন রিটায়ার করে জয়ন্তবাবুর বাড়িতেই গেস্ট হয়ে থাকেন। আর্টিস্টকে এই বয়সে রিটায়ার করতে শুনিনি কখনও, তাই একটু অবাক লাগল। এবার লক্ষ করলাম বৈঠকখানার দেয়ালে একটা ছবি–এক মহিলার, বছর চল্লিশেক বয়স-তার তলার কোণের দিকে লেখা এস, সোম। ইনিই কি শকুন্তলা দেবী? বয়স বেশি হলেও চেহারায় বেশ একটা জৌলুস রয়েছে। তখন অবিশ্যি শকুন্তলা দেবী আর ছবি করেন। না। সুদর্শন সোম এবার বেয়ারার ট্রে থেকে একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিলেন। ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি কষ্ট হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা বলছিলেন স্যামুয়েল সালডানহা! ইনি রাজনীতি নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন রতনলাল ব্যানার্জির সঙ্গে। সেই তর্কে দেখলাম সুদর্শন সোমও যোগ দিলেন।

আমি খালি ভাবছিলাম শকুন্তলা দেবীর হারটা কখন দেখা যাবে। দুই গিন্নিকে দেখছি অতিথিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলেছেন। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী সুনীলা দেবী ফেলুদাকে এসে বললেন, আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছেন, ব্যাপার কী-আপনি ড্রিংক করেন না বুঝি?

ফেলুদা হেসে বলল, না, আমাদের পেশায় মাথাটা সব সময় ঠাণ্ডা রাখাই ভাল।

কিন্তু আমি তো জানতাম প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ভীষণ ড্রিংক করে।

সেটা আপনার ধারণা হয়েছে বোধহয় আমেরিকান ক্রাইম উপন্যাস পড়ে।

তাই হবে। আমি ভীষণ গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত।

ভাল কথা, ফেলুদা আর না বলে পারল না, আপনার স্বামী বলছিলেন আজ শকুন্তলা দেবীর হারটা একবার আমাদের দেখবেন।

ও হ্যাঁ-তা তো বটেই-দেখেছেন, আমি একদম ভুলে গেছি। শীলা!

শীলা তার মা-র দিকে এগিয়ে এল।

কী মা?

যাও তো সোনা—তোমার দিদিমার হারটা একবার নিয়ে এসে তো! জানো তো চাবি কোথায় আছে। মিঃ মিত্র একবার দেখতে চাইছেন।

শীলা তক্ষুনি চলে গেল আদেশ পালন করতে।

চাবি বুঝি আপনার কাছে থাকে না? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

না। ওটা থাকে আমার ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে। হারটা থাকে সিন্দুকে। এ বাড়িতে চুরি হবার কোনও ভয় নেই। আমার চাকররা সব পুরনো। সুলেমান-যে আপনাদের দরজা খুলে দিল—সে আছে আজ ত্রিশ বছর। অন্য চাকরীও সব পুরনো আর বিশ্বস্ত।

তিন মিনিটের মধ্যে শীলা ফিরে এল-তার হাতে একটা গাঢ় নীল মখমলের বাক্স। মেয়ের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে নিলেন সুনীলা দেবী। তারপর এই যে বলে বাক্সটা খুলে এগিয়ে দিলেন ফেলুদার দিকে।

আমি আর লালমোহনবাবু বাক্সটার দুদিকে দাঁড়ালাম, আর দুজনের মুখ থেকে একই সঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক নিশ্বাস টানার শব্দ বেরিয়ে এল।

এমন অপূর্ব গয়না আমি কখনও দেখিনি। নকশাদার সোনার হার। তাতে হিরে থেকে শুরু করে যত রকম মণিমুক্তো হয় সব বসানো!

আশ্চর্য জিনিস, বলল ফেলুদা। এরকম হার দুটি হয় না। এটার আজকের দর কত হতে পারে তা আন্দাজ আছে আপনার?

তা দুই আড়াই লাখ হবে নিশ্চয়ই। থাক—এটা আর বেশিক্ষণ বাইরে রাখা ভাল না। নাও, শীলা, এটা আবার রেখে দিয়ে এসো।

শীলা হারটা নিয়ে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম যে জয়ন্তবাবুর ছেলে আমাদের দিকে বেশি ঘেঁষছে না। দেখে মনে হল ছেলেটি মিশুকে নয়। আর পার্টিটাও যেন সে বিশেষ উপভোগ করছে না। অবিশ্যি এই টাইপের এই বয়সী ছেলেরা এরকমই হয়, এটা কলকাতাতেও লক্ষ করেছি। এরা নিজেরা দল ছাড়া কোনও দলের সঙ্গেই মিশতে পারে না।

ড্রিংকসের পর্ব বোধহয় শেষ হল, কারণ এবার একজন ভদ্রলোক এসে এক রোল ফিল্ম নিয়ে প্রোজেক্টরে চাপাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, আমি রেডি আছি।

জয়ন্তবাবু এবার ঘোষণা করলেন যে শকুন্তলা দেবী অভিনীত কপালকুণ্ডলা ছবির একটা রিল দেখানো হবে। সুলেমান, ঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দাও তো।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্রোজেক্টর চলতে শুরু করল। পদায় ছবি নড়ে উঠল। সেই আদ্যিকালের ছবি। জয়ন্তবাবু বললেন, এটা ১৯৩০ সালের ছবি। ভারতবর্ষে টিকি আসার ঠিক আগে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম শকুন্তলা দেবীকে। দেখলে মেমসাহেব মনে হয় না। চেহারা সত্যি খুবই সুন্দর-আজকের দিনেও পদায় এত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাইলেন্ট ছবির যা দোষত্রুটি আর থিয়েটারি অভিনয় সেটাও যে নেই এই কপালকুণ্ডলায় তা নয়। তবুও জানা গেল শকুন্তলা দেবীর পপুলারিটির খানিকটা কারণ। মহারাজা থেকে শুরু করে পানবিড়িওয়ালা পর্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। সকলেই তাঁর ছবি দেখত আর বাহবা দিত।

দশ মিনিট চলে ছবি বন্ধ হল।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। সকলে আবার কথাবার্তা শুরু করল।

এই অন্ধকার অবস্থাতেই যে আরেকজন ঘরে ঢুকেছে তা টের পাইনি। এঁকে আমরা চিনি। ইনি হলেন মিঃ সুকিয়াস। ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পার্টির দিনে এসে পড়ার জন্য। অর্থাৎ ইনি নিমন্ত্রিত হননি–এমনি বোধহয় জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বেয়ারা এসে খবর দিল পাত পড়েছে–ডিনার ইজ সার্ভড।

চমৎকার মোগলাই রান্না খেয়ে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বেজেছে সোয়া এগারোটা। পার্টি যে আরও কিছুক্ষণ চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৪. ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম

পরদিন সকালে ফেলুদা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

কী ব্যাপার ফেলুদা?

ফেলুদার মুখ গম্ভীর।

জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন। এক্ষুনি। শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার মিসিং।

সর্বনাশ!

তুই চট করে তৈরি হয়ে নে; আমি লালমোহনবাবুকে খবরটা দিয়ে আসছি। আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়েই যেতে হবে ওখানে। শুধু মিঃ সুকিয়াস ছাড়া আর সকলেই এসেছে ওখানে। খবরটা পেয়ে।

পুলিশে খবর দেয়নি?

দিয়েছে, কিন্তু আমাকেও চায়।

আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে জয়ন্তবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। বাড়ির সবাই কেমন যেন পাথরের মতো চুপ। ফেলুদা ক্ষমা চাইল। কাল আমাদের দেখানোর জন্যই হারটা বার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এ চুরির কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু আমি নিজে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছি বলে কথাটা বললাম।

পুলিশের লোক আগেই এসে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যিনি কত তিনি ফেলুদার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। আপনি তো বোধহয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিঃ মিটার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা।

আই অ্যাম ফ্যামিলিয়ার উইথ ইয়োর নেম, বললেন পাণ্ডে। আপনার কয়েকটা সাক্সেসফুল ইনভেস্টিগেশনের কথা আমার মনে আছে। তা আপনি তো বোধহয় জেরা করতে চান।

আগে আপনার কাজ শেষ হয়ে যাক, বলল ফেলুদা। তারপর আমার।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

প্রশ্ন করে জানা গেল যে কাল রাত্রে সবাই চলে যাবার পর বারোটা নাগাদ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী তাঁর বেডরুমে গিয়ে শুতে যাবার আগে কেন জানি আরেকবার হারটা দেখার ইচ্ছা অনুভব করেন। হয়তো কপালকুণ্ডলা ছবিতে শকুন্তলা দেবীকে হার পরা অবস্থায় দেখেই সে ইচ্ছেটা জাগে। ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, এটা একটা ভ্যানিটির ব্যাপার। আমার মা-র গলায় হারটা এত সুন্দর মানাত; সেটা দেখেই আমার মনে একটা ইচ্ছে হল হারটা একবার পরে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। মেয়েরা শুতে যাবার আগে বেশ খানিকটা সময় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাটায়। সেই সময়ই দেরাজ থেকে চাবিটা বার করে সিন্দুক খুলে দেখি হারটা নেই। আমি তৎক্ষণাৎ আমার মেয়েকে ডাকি। মেয়ে জোর দিয়ে বলে যে সে সিন্দুকেই রেখে ছিল হারটা। সেখানে ছাড়া আর কোথায়ই বা রাখবে? সিন্দুকেই তো চিরকাল থেকেছে হারটা।

আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখেছেন হারটা? পাণ্ডে জিজ্ঞেস করল।

কোথায় আর খুঁজব বলুন, বললেন সুনীলা দেবী, ওটা যে কেউ সিন্দুক থেকে বার করে নিয়েছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

আপনাদের বাড়িতে কাল পার্টি ছিল, তাই না? পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, বললেন জয়ন্তবাবু।

কটা থেকে কটা পর্যন্ত?

আটটা থেকে পৌনে বারোটা।

মিসেস বিশ্বাস, আপনি কি পার্টির পরেই আপনার ঘরে চলে যান?

হ্যাঁ।

আর তার কতক্ষণ পরে আবিষ্কার করেন যে হারটা নেই?

মিনিট পনেরো।

এর মধ্যে আপনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোননি?

না।

অর্থাৎ হারটা চুরি হয়েছে ডিউরিং দ্য পার্টি?

তাই তো মনে হয়, বললেন জয়ন্তবাবু। এখানে একটা কথা বলি—পার্টির মধ্যে হারটাকে আমার মেয়ে একবার সিন্দুক থেকে এই ঘরে আনে—মিঃ মিত্রকে দেখানোর জন্য।

তার পরেই—তখনই কি আপনার মেয়ে হারটাকে আবার সিন্দুকে তুলে দেয়?

হ্যাঁ, বলল মেরি শীলা। আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি।

এখানে একটা জরুরি কথা বলা দরকার, বললেন জয়ন্তবাবু। হারটা তুলে রাখার কিছু পরেই এ ঘরে একটা দশ মিনিটের ফিল্ম দেখানো হয়।

তার জন্য তখন বাতি নেবানো হয়েছিল?

হ্যাঁ।

এ বাড়িতে চাকর কজন?

তিনজন। একজন রান্না করে। আর দুজন বেয়ারা।

কতদিনের লোক এরা?

কেউই পনেরো বছরের কম না। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী। সুলেমান তো আমার শ্বশুরের আমল থেকে আছে।

তা হলে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে, বললেন পাণ্ডে। জিনিসটা শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। এই বাড়ির লোক সমেত এই পার্টিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরই একজন হারটা নিয়েছেন।

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল, আর আমার মনে হয় ফেলুদা আর লালমোহনবাবুরও তাই।

পাণ্ডে এবার ফেলুদার দিকে ফিরলেন।

মিঃ মিটার, আপনার সঙ্গে যে দুজন এসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, বলল ফেলুদা। ইনি আমার কাজিন তপেশ মিত্র, আর ইনি আমার বন্ধু–বিখ্যাত লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী।

এই লেখকটিকে আপনি কতদিন হল চেনেন?

বছর পাঁচ- ছয়।

আমি লালমোহনবাবুর দিকে দেখছিলাম। ভদ্রলোক ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমি ওঁকে কণ্ঠহার চোর হিসেবে কল্পনা করলাম। এই সংকটের অবস্থাতেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

এরার পাণ্ডে অন্য প্রশ্নে গেলেন।

এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কজন এ বাড়িতে থাকেন?

জয়ন্তবাবু বললেন, আমি, আমার স্ত্রী, আমার দুই ছেলেমেয়ে এবং আর্টিস্ট মিঃ সোম।

মিঃ সোম আজও দাড়ি কামাননি। তাই তাঁকে আরও অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

আর সকলেই বাইরের লোক? পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ।

মিঃ সালডানহা থাকেন ক্লাইভ রোডে। উনি আমার ব্রাদার-ইন-ল। ওঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীর বড় বোন।

আরেকজনকে দেখছি, রতনলালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন মিঃ পাণ্ডে।

উনি রতনলাল ব্যানার্জি-আমার স্ত্রীর ছোট ভাই।

এ ছাড়া আর কেউ ছিল?

একজন ছিলেন। লাটুশ রোডের মিঃ সুকিয়াস। উনি অবশ্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন না, এমনিই এসে পড়েন। তিনি এসেছিলেন যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছে তার মাঝখানে। আলো জ্বালার পরে আমি তাঁকে দেখি।

এই সুকিয়াসের প্রেফেশন কী?

হি ইজ এ কালেক্টর অফ আর্ট অবজেক্টস। তা ছাড়া তেজারতির কারবার আছে।

ইনি কি এই হারটা সম্বন্ধে কোনওদিন ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলেন?

উনি ওটা কিনতে চেয়েছিলেন। আমরা বিক্রি করিনি।

আই সি

ইনস্পেক্টর পাণ্ডে একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে কাল এখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হারটা নিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, সেই হারটা কোথায়।

জয়ন্তবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে বললেন, আপনি যদি সার্চ করতে চান তা হলে করতে পারেন। এমনকী ব্যক্তিগত খানাতল্লাশিতেও আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

পাণ্ডে বললেন, তা তো করতেই হবে। সার্চ থেকে মহিলারাও বাদ পড়বেন না। এবং তার জন্য আমি মেয়ে পুলিশের বন্দোবস্ত করছি। তা ছাড়া বাড়িটাও ভাল করে সার্চ করা দরকার।

সার্চের ব্যাপারে দেখলাম। কেউই আপত্তি করলেন না। খালি সালডানহা বললেন, আমার দোকান খুলতে হবে দশটার সময়। তার মধ্যে আমার সার্চটা হয়ে গেলে ভাল।

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, এখানে সার্চ চলুক! আমি তা হলে এখন আসি। যদি হারটা পাওয়া যায় তা হলে আশা করি জয়ন্তবাবু আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। না হলে আমি ও বেলা আবার আসব।

আমরা তিনজনে হোটেলে ফিরে এলাম। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে আমাদের ঘরেই এলেন। ভদ্রলোক ঢুকেই বললেন, এ নিয়ে কবীর হল বলুন তো, যে আমরা বেড়াতে গিয়ে কেসে জড়িয়ে পড়েছি? এ জিনিস টেলিপ্যাথি ছাড়া হয় না।

ফেলুদা বলল, দেখি আপনার স্মরণশক্তি কতদূর। তোপ্‌সেকে তো এর আগে অনেকবার পরীক্ষা করেছি, আপনাকে কখনও করা হয়নি।

ভেরি ওয়েল স্যার, আই অ্যাম রেডি, বললেন জটায়ু।

আগে শকুন্তলা দেবীর ফ্যামিলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।

করুন।

ভদ্রমহিলার তিন সন্তানের নাম বলুন তো।

বড় মেয়ে সুশীলা–

তার আগে একটা ক্রিশ্চান নাম আছে।

ও হ্যাঁ-ক্রিশ্চান নাম...ক্রিশ্চান নাম...

তোপ্‌সে বলতে পারিস?

আমার মনে ছিল। বললাম, মার্গারেট।

ভেরি গুড। তার পরের মেয়ে, অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী? এই প্রশ্নটা কিন্তু লালমোহনবাবুকে করছি।

লালমোহনবাবু এটা ভোলেননি। বললেন, প্যামেলা সুনীলা।

গুড। তাঁর পরের ভাই?

ইয়ে–রতনলাল। অ্যালবার্ট রতনলাল।

এবার সুশীলা দেবীর স্বামীর নাম?

স্যামুয়েল সালডানহা।

ভেরি গুড! সুনীলা দেবীর ছেলেমেয়ে?

মেয়ে শীলা-মেরি শীলা। আর ছেলে প্রসেনজিৎ। ক্রিশ্চন নাম ভুলে গেছি।

ভিক্টর। আর কে ছিলেন কাল পার্টিতে?

সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়ছে না।

তোপ্‌সে?

সোম। সুদর্শন সোম।

গুড।

কিছু মাইন্ড করবেন না মশাই, লালমোহনবাবু বললেন, ভদ্রলোককে কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

কেন?

কীরকম পাগলাটে চেহারা। দাড়ি কামাননি।

আর্টিস্টরা সব সময় সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে না।

তা হতে পারে। মোট কথা, উনি আর আরেকজন আমার কাছে এই চুরির ব্যাপারে প্রাইম সাসপেক্টস।

আরেকজন কে?

জয়ন্তবাবুর ছেলে প্রসেনজিৎ? একেবারে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের বাউণ্ডুলেদের মতো চেহারা। অবশ্য মদ তো দেখলাম খায় না ছেলেটি।

খেলেও হয়তো বাপের সামনে খায় না।

এনিওয়ে, পার্টিতে কিন্তু আরেকজন ছিলেন।

মিঃ সুকিয়াস তো?

হ্যাঁ। এর কিন্তু হারটার উপর লোভ ছিল।

যে কোনও আর্ট কালেক্টরেরই থাকবে। সেটা কিছুই আশ্চর্য না। আর্ট কালেক্টর হলে কিনতে চাইবে। আর অভাবী লোক হলে হাতাতে চাইবে। এঁদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোনও কিছুই জানি না। কাজেই এখন অন্ধকারে হাতড়ে লাভ নেই। বিকেলে জয়ন্তবাবু ফোন করবেন, তার আগে পর্যন্ত আমরা ফ্রি। চলুন, আপনাকে কাইজার-বাগটা দেখিয়ে আনি।

ভেরি গুড আইডিয়া, বললেন লালমোহনবাবু। তদন্তের চাপে যদি লখ্নৌ শহরটা দেখা সম্পূর্ণ না হয় তা হলে খুব আপশোস থেকে যাবে।

৫. পুলিশ সার্চ করে কিছু পায়নি

বিকেলে কথামতো জয়ন্তবাবু ফোন করলেন। পুলিশ সার্চ করে কিছু পায়নি। বাড়ির চাকরীদের জেরা করা হয়েছে, তাতেও কোনও ফল হয়নি। ফেলুদা বলল, চল, এবার একবার জয়ন্তবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। এবার ফেলুমিত্তিরের কাজ শুরু। অবিশ্যি পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়েই যাবে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না।

হোটেলেই ট্যাক্সি ছিল, একটা নিয়ে গুমতীর ব্রিজ পেরিয়ে জয়ন্তবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। আজ বাড়িটাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল, বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

সুলেমান এসে দরজা খুলে দিল, আমরা তিনজন ভিতরে ঢুকলাম! জয়ন্তবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বৈঠকখানায়, আমাদের দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে এলেন।

ওটা পাওয়া গেল না, প্রথম কথাই বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদা বলল, সেটা অস্বাভাবিক নয়। আমারও মনে হয়েছিল ওটা পাওয়া যাবে না। যে নিয়েছে সে তো আর বোকা নয় যে হাতের কাছে রেখে দেবে জি

আপনিও কি আলাদা করে। সার্চ করতে চান?

না, বলল ফেলুদা? আমি আপনার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এখন এ বাড়িতে কে কে রয়েছেন?

আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, ছেলে বোধহয় এখনও ফেরেনি। আর আছেন সোম-যার সঙ্গে কাল আপনাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার কিন্তু মিঃ সালডানহার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। আর মিঃ সুকিয়াস।

সেটা কোনও অসুবিধা নেই। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি ফোনে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করে চলে যাবেন।

তা হলে আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক।

বেশ তো।

আমরা সকলেই সোফায় বসলাম।

একটু চা খাবেন তো? জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

তা খেতে পারি।

জয়ন্তবাবু সুলেমানকে ডেকে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর ফেলুদা একটা চারমিনার, ধরিয়ে তার প্রশ্ন শুরু করল।

আপনি বলছিলেন সুকিয়াস আপনার শাশুড়ির হারটা কিনতে চেয়েছিলেন। সেটা কতদিন আগে?

বছরখানেক হবে।

সুকিয়াস জানলেন কী করে এই হারের কথা?

এটার কথা অনেকেই জানে। এককালে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল তো। আমার শাশুড়ি মারা যাবার পর তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানকার পারোনিয়ার কাগজে বেরিয়েছিল। তাতে হারের কথাটা ছিল। সুকিয়াস এমনিতে মানিলেন্ডার, তেজারতির কারবার করে। ভাবলে মনে হয় এমন লোকের শিল্পের দিকে কোনও ঝোঁক থাকবে না। কিন্তু সুকিয়াস এ ব্যাপারে একটা বিরাট ব্যতিক্রম। আমি ওর বাড়িতে গিয়েছি, ওর সংগ্রহ দেখেছি। দেখবার মতো সব জিনিস আছে। ওর কাছে। ওর রুচি অনবদ্য।

আপনি যখন হারটা বিক্রি করলেন না, তখন ওর প্রতিক্রিয়া কী হয়?

ও খুবই হতাশ হয়েছিল। ও দু লাখ টাকা অফার করেছিল। আমি নিজে হলে কী করতাম জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী হারটার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। কোনও মতেই ওটা হাতছাড়া করবে না। আর সেই হারই...

জয়ন্তবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আপনি কাউকে সন্দেহ করেন এই ব্যাপারে?

আমি সম্পূর্ণ হতভম্ব। চাকর বাকর কাউকেই আমার সন্দেহ হয় না। ওরা বেইমানি করবে। এটা আমি বিশ্বাস করি না; অথচ তার বাইরে কে যে এটা নিতে পারে, এবং কেন, সেটা বোঝার সাধি; আমার নেই।

আপনি তো ব্যবসাদার, ফেলুদা বলল।

ব্যবসাদার মানে আমার একটি ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের আপিস আছে।

কেমন চলে আপিস?

ভালই। আমাদেরই কোম্পানি। আমার একজন পার্টনার আছে।

কী নাম?

ত্রিভুবন নাগর। এখানকারই লোক। আমার প্রথম জীবনে আমি ব্যবসায় ছিলাম না, একটা সওদাগরি আপিসে চাকরি করতাম। নগর ছিল আমার বন্ধু। ত্রিশ বছর আগে নাগর আর আমি মিলে আমাদের ব্যবসা শুরু করি।

আপনাদের কোম্পানির নাম কী?

মডার্ন ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।

কোথায় আপনাদের আপিস?

হজরতগঞ্জে।

ইতিমধ্যে আমাদের চা এসে গেছে, আমরা খেতে শুরু করে দিয়েছি। ফেলুদা বলল, আরেকটা প্রশ্ন আছে।

কী?

কাল যখন ফিল্মটা চলছিল তখন আপনি কাউকে চলাফেরা করতে, কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন?

উঁহু।

আপনার ছেলে কোনও চাকরি করে?

এখনও না। ওকে আমার আপিসে ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও রাজি হয়নি।

ওর বয়স কত?

পঁচিশ।

ওর কোনদিকে ঝোঁক?

ঈশ্বর জানেন।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায় কি?

নিশ্চয়ই। ও খুবই ডিপ্রেসড হয়ে পড়েছে, বুঝতেই পারেন।

আমি বেশি বিরক্ত করব না ওঁকে?

চা খাবার পর জয়ন্তবাবু গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করেছেন সেটা এখনও দেখলে বোঝা যায়। দিনের বেলা দেখে আরও বেশি করে। মনে হল যে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে এঁর আশ্চর্য চেহারার মিল। ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন, আপনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলেন...?

ফেলুদা বলল, হ্যাঁ। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না। সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন।

বলুন।

আপনার মা যে হারটা আপনার দিদিকে না দিয়ে আপনাকে দিলেন তাতে আপনার দিদির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

তিনি বোধহয় এ ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন।

কেন?

দিদি ছিল আমার বাবার ফেভারিট, আর আমি ছিলাম মা-র। মা মারা যাবার তিন বছর। আগে হারটা আমাকে দেন। দিদির মনের অবস্থা কী হয়েছিল বলতে পারব না, কারণ এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনও কোনও আলোচনা হয়নি।

আপনার দিদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?

হ্যাঁ। যত দিন যাচ্ছে। আমরা দুজনে তত আরও কাছাকাছি এসে পড়ছি। যখন ইয়াং ছিলাম তখন দুজনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব ছিল।

আপনি তো অভিনয় করতে খুব ভালবাসেন?

হ্যাঁ। তাই তো মা আমাকে নিয়ে এত প্রাউড় ছিলেন। এ ব্যাপারে দিদির কোনও শখ ছিল না।

আপনার মেয়ের?

শীলা স্কুলে কলেজে অ্যাকটিং করেছে, ক্লাবে-স্ট্রলাবেও দু-একবার করেছে। তার বেশি নয়; ও ফিল্মে অফার পেয়েছে, কিন্তু নেয়নি।

ও কী করতে চায়?

ও ওয়ার্কিং গার্ল হতে চায়। আপিসে কাজ করবে, নিজে রোজগার করবে; ও তো সবে বি এ পাশ করেছে। এর মধ্যে কিছু জানালিজম করেছে, খবরের কাগজে ওর দু-একটা লেখা বেরিয়েছে।

আপনি কি এই চুরির ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন?

কাউকেই না। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না।

কাল যখন ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল তখন কাউকে হাঁটাচলা করতে দেখেছিলেন?

না। মনে হল সকলেই তন্ময় হয়ে ছবিটা দেখছে।

ঠিক আছে, মিসেস বিশ্বাস। আপনার ছুটি।

মিসেস বিশ্বাস ধন্যবাদ দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুর দিকে ফিরল।

আমি একবার মিঃ সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বেশ তো, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

দু মিনিটের মধ্যে সুদর্শন সোম এসে হাজির হলেন। আজ তিনি দাঁড়ি কামিয়েছেন কোনও একটা সময়, তাই তাঁকে একটু ভদ্রস্থ লাগছে। তিনি ফেলুদার সামনের সোফায় বসলেন, তাঁর মুখে চুরুট। কাল পার্টিতে একে চুরুট খেতে দেখেছি! কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

ফেলুদা প্রশ্ন শুরু করল।

আপনি কত দিন এ বাড়িতে রয়েছেন?

বছর পনেরো হল। শকুন্তলা দেবীই আমাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন।

আপনি এক কথায় রাজি হয়ে যান? পরের আশ্রিত হতে কোনওরকম দ্বিধা-সংকোচ বোধ করেননি?

তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসছে। এখন আমার বয়স সাতষট্টি। তখনই আমি পঞ্চাশের উপর। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আরথ্রাইটিস, তাই ছবি আঁকতে পারছি না। শকুন্তলা দেবীর অনুগ্রহে আমার তবু একটা সংস্থান হল। তা না হলে আমি যে কী করতাম জানি না। আমায় না খেয়ে মরতে হত। অবশ্য পরের চ্যারিটি ভোগ করছি এই নিয়ে অনেকদিন খুব সচেতন ছিলাম, মনটা খচখচ করত। কিন্তু এঁরাও আমার উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন, শীলা আর প্রসেনজিৎ আমাকে খুব ভালবাসত, তাই ব্যাপারটা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আপনার নিজের রোজগার বলে তো কিছুই নেই।

দু-একটা পুরানো ছবি মাঝে মাঝে অল্প দামে বিক্রি হয়। সে তেমন কিছুই না; সত্যি বলতে কী, আই অ্যাম পেনিলেস। জয়ন্তবাবু আমাকে প্রতি মাসে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দেন, আর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা রয়েছে। চুরুটের অভ্যাসটা অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারিনি। তবে অনেক কমিয়ে দিয়েছি।

এই চুরির ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

মিঃ সোম একটু ভেবে বললেন, চাকরদের কাউকে হয় না।

তবে কাকে হয়?

মিঃ সোম আবার চুপ করে গেলেন। ফেলুদা বলল, আপনি ইতস্তত করলে কিন্তু আমার কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি নিশ্চয়ই চান যে শকুন্তলা দেবীর হারটা আবার উদ্ধার হোক।

তা তো বটেই।

তা হলে বলুন আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি না।

একজনকে হয়।

কে সে?

প্রসেনজিৎ।

কেন এ কথা বলছেন?

প্রসেনজিৎ আর আগের মতো নেই। সে অনেক বদলে গেছে। আমার ধারণা সে কুসঙ্গে পড়েছে। হয়তো জুয়া খেলে, নেশা করে, তার জন্য তার টাকার দরকার পড়ে। চাকরি-বাকরি তো কিছুই করে না। বাপ তাকে যা দেন তাতে তার চলে না। সে আমার কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা ধার চায়। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দেয় না।

আই সি...। কাল যখন সিনেমা হচ্ছিল তখন কাউকে নড়াচড়া করতে বা জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন?

আজ্ঞে না। আমি পদায় ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।

ঠিক আছে, মিঃ সোম। অনেক ধন্যবাদ। এবার আপনি যদি শীলাকে একটু পাঠিয়ে দেন।

মিঃ সোম শীলার খোঁজে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীলা এসে পড়ল। তার পরনে সালওয়ার কামিজ, গায়ে কোনও গয়না নেই। একেবারে আধুনিকা।

কী করছিলে, শীলা? শীলা সোফায় বসার পর ফেলুদা প্রশ্ন করল।

একটা আর্টিকল লিখছিলাম।

খবরের কাগজের জন্য?

হ্যাঁ।

কী বিষয়?

ঘর কী করে সাজাতে হয় তাই নিয়ে।

তুমি কি ইনটিরিয়র ডেকোরেশনে ইন্টারেস্টেড নাকি?

হ্যাঁ। ওটাকেই আমার প্রোফেশন করার ইচ্ছে আছে।

ও বিষয় শিখেছি কিছু?

এমনি কিছু শিখিনি, কিন্তু ও বিষয় অনেক বই পড়েছি।

আঁকতে পার?

মোটামুটি। ছেলেবেলায় সুদর্শনকাকু আমাকে খুব এনকারেজ করতেন। যখন আমার বারো-তেরো বছর বয়স।

তোমার দাদার সঙেগ তোমার সম্পর্ক কীরকম?

আগে দুজনে খুব বন্ধু ছিলাম। এখন দাদা বদলে গেছে। আমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না।

তাতে তোমার খারাপ লাগে না?

আগে লাগত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

কাল রাত্রে হারটা আমাদের দেখিয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখেছিলে তো?

নিশ্চয়ই। চাবিও ঠিক জায়গায় রেখেছিলাম।

তারপর সেটা কী ভাবে উধাও হল সে বিষয়ে তোমার কোনও ধারণা আছে?

আমার কী করে থাকবে? শীলা একটু হেসে বলল। বরং আপনার থাকা উচিত। আপনি তো ডিটেকটিভ।

তা জানি।

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় বেলের শব্দ হল। সুলেমান দরজা খুলে দিতে প্রসেনজিৎ ঢুকল। সে আমাদের দেখে যেন একটু হকচাকিয়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সামলে নিয়ে বলল, ডিটেকটশন চলছে বুঝি?

ফেলুদা বলল, তোমার বোনকে প্রশ্ন করছিলাম কালকের ব্যাপার নিয়ে। এবার ভাবছি তোমাকে করব, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

আপত্তি আছে বই কী। পুলিশও আমাকে জেরা করার চেষ্টা করেছিল। আমি কোনও কথার জবাব দিইনি।

কিন্তু আমি তো পুলিশ নই।

ইট মেক্স নো ডিফারেন্স। কোনও কথার জবাব আমি দেব না।

তা হলে কিন্তু তোমার উপর সন্দেহ পড়তে পারে।

পড়ুক। আই ডোন্ট কেয়ার। শুধু সন্দেহে তো আর কিছু হবে না। প্রমাণ চাই, সেই হারটা খুঁজে পাওয়া চাই।

বেশ, তুমি যখন কো-অপারেট করবে না। তখন আমাদের দিক থেকেও বলার কিছু নেই। আমরা তোমাকে ফোর্স করতে পারি না।

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দুজনও।

কিন্তু ফেলুদার কাজ শেষ হয়নি। সে বলল, আমি এবার বাড়ির প্ল্যানটা দেখতে চাই।

শীলা বলল, চলুন, আমি আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।

যা দেখলাম তা মোটামুটি এই—বৈঠকখানার পরেই খাবার ঘর, তারপর জয়ন্তবাবু আর সুনীলা দেবীর বেডরুম, তার সঙ্গে বাথরুম। এই বেডরুমের দুপাশে আরও দুটো বাথরুম সমেত বেডরুম, সে দুটোর একটাতে থাকে শীলা, অন্যটায় প্রসেনজিৎ। জয়ন্তবাবুর ঘর থেকে দুটো ঘরে যাবার জন্য দরজা আছে। প্রসেনজিতের ঘরের পাশে একটা ছোট্ট গেস্টরুম আছে তাতে থাকেন। মিঃ সোম।

প্ল্যানটা দেখে বৈঠকখানায় ফিরে এলে শীলা ফেলুদাকে বলল, আমি কিন্তু দু- এক'দিনের মধ্যেই অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আসছি।

আমি তো বলেইছি। ফেলুদা বলল, যখন ইচ্ছে এসো—তবে একটা ফোন করে এসো। আমি তো এখন তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি-কখন কোথায় থাকি বলতে পারি না। ভাল কথা—তোমার বাবাকে একবার আসতে বলবে? একটু দরকার ছিল।

শীলা জয়ন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিল।

হেল আপনার কোয়েশ্চনিং? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

তা হল, তবে আপনার ছেলে কোনও প্রশ্ন করতে দিল না।

জয়ন্তবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, প্রসেনজিৎ ওরকমই। ওর আশা আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

যাই হোক—আপনাকে ডাকার কারণ-মিঃ সালডানহা কি এখনও দোকানে থাকবেন?

এখন তো সাড়ে পাঁচটা—এখনও নিশ্চয়ই থাকবে।

তা হলে ওঁর দোকানের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা যদি দেন।

জয়ন্তবাবু তখনই টেলিফোনের পাশে রাখা প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে ফেলুদার হাতে দিলেন।

এখান থেকেই ফোন করে নিই? বলল ফেলুদা।

সার্টেনলি।

ফেলুদা ফোন করতেই ভদ্রলোককে পেয়ে গেল। উনি তখনই ফেলুদাকে চলে আসতে বললেন।

আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা বাকি থেকে যাচ্ছে, বলল ফেলুদা, তিনি হলেন আপনার শালা রতনলালবাবু। মিঃ সুকিয়াসকে কাল প্রশ্ন করব।

রতনলাল থাকে ফ্লেজার রোডে একটা ফ্ল্যাটে। তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তাকে পাবার ভাল সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার পর।

৬. হজরতগঞ্জে সালডানহা অ্যান্ড কোম্পানি

হজরতগঞ্জে সালডানহা অ্যান্ড কোম্পানিতে পৌঁছে একটু হক্‌চকিয়েই গেলাম। এত পুরনো দোকান সেটা ভাবতে পারিনি। আর পনেরো মিনিট পরেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ভদ্রলোক একটা ডেস্কের পিছনে বসে ছিলেন, দোকানে কোনও খদ্দের নেই, খালি একজন কর্মচারী। এদিক ওদিক ঘুরছে। সালডানহা আমাদের দেখেই হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আসুন, বসুন, মিঃ মিটার।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম। এখানে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেললাম না তো? ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

মোটেই না। এখন তো ক্লোজিং টাইম এসে গেল। এখানে আপনার কী কথা আছে বলে নিন, তারপর আপনাদের আমার গাড়িতে করে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। সেখানে কফি খবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন।

তা হলে ভালই হবে, বলল ফেলুদা, কারণ আপনার স্ত্রীকেও দু-একটা প্রশ্ন করার আছে। কালকের পার্টির সকলকেই আমরা প্রশ্ন করছি।

দ্যাটুস অল রাইট। আই ডোন্ট থিংক সি উইল মাইন্ড।

আমার প্রথম প্রশ্ন——আপনার এ দোকান কতদিনের?

তা প্রায় সত্তর বছর হল। আমার ঠাকুরদাদা দোকানটার পত্তন করেন। লখ্‌নৌ-এর প্রথম মিউজিক শপ।

কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আরও মিউজিক শপ হয়েছে?

আরও দুটো হয়েছে–দুটোই আমাদের জাতভাইদের করা। একটার মালিক ডিমেলো, আরেকটার নিরোনহো! এদের মধ্যে একটা আবার হজরতগঞ্জেই–আমার দোকানের কাছেই। দুঃখের বিষয় আমরা ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনি। সেটা বোধহয় দোকানের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন।

আপনাদের ব্যবসা তার মানে ভাল চলছে না?

কী আর বলব, মিঃ মিটার। এটা কম্পিটিশনের যুগ। আমার ছেলেকে যদি দোকানে বসাতে পারতাম তা হলে তার ইয়াং আইডিয়াজ অনেক কাজে দিত। কিন্তু সে ডাক্তারি পাশ করে চলে গেল। আমেরিকা। এখন অবশ্য সে সেখানে খুব ভালই রোজগার করছে। আর আমি বুড়ো মানুষ একই দোকান সামলাচ্ছি। বিক্রি যে একেবারে হয় না তা নয়, আমার কিছু ফেইথফুল কাস্টমারস আছে; কিন্তু আজকাল যুগ অনেক বদলে গেছে। অনেস্টির আর দাম নেই; লোকে চায় চটক।

ফেলুদা সহানুভূতি প্রকাশ করে আসল প্রশ্নে চলে গেল।

কাল যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে?

কী আর বলব বলুন। ও হার যখন আমার স্ত্রী না পেয়ে আমার শালি পেল, তখন মার্গারেট একেবারে ভেঙে পড়ে। সি লাভ্ড দ্যাট নেকলেস। কার না ভাল লাগবে। বলুন—এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর প্রাইসলেস জিনিস?

আপনি বলছেন ঈশ্বরের চোখেও এটা একটা অন্যায় বলে মনে হয়েছিল?

তা না হলে প্যামেলার এ ক্ষতি হবে কেন? শকুন্তলা দেবীর পক্ষপাতিত্ব ভগবানের চোখেও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই।

কিন্তু কে এই হারটা নিতে পারে সে বিষয় আপনার কোনও ধারণা আছে?

নো, মিঃ মিটার। সে বিষয় আমি আপনাকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য করতে পারব না। আমার কোনও ধারণা নেই।

সুনীলা দেবীর ছেলে যে কুপথে যাচ্ছে সেটা আপনি জানেন?

আমি সেটা আন্দাজ করেছি।

সে বোধহয় নেশা করে। আর তার জন্য তার প্রায়ই টাকার দরকার হয়।

সালডানহা চুকচুক করে আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন। তারপর বললেন, দ্যাট মে বি সো। কিন্তু তাই বলে সে তার মা-র এমন একটা সাধের জিনিস চুরি করবে? এটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

কাল ফিল্মটা চলার সময় কাউকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিলেন?

নো। বাট আই স সুকিয়াস কমিং ইন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মিঃ সালডানহার গাড়িতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন সোয়া ছটা—সবে সন্ধে হয়েছে।

সালডানাহার বাড়ি জয়ন্তবাবুর বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট। এটাও এক-তলা বাংলো টাইপের বাড়ি। ভেতরে ঢুকে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। এ বৈঠকখানায় জয়ন্তবাবুর বাড়ির বৈঠকখানার বাহার নেই। বোঝাই যায় সালডানাহার অবস্থা তেমন ভাল না। এবং তাঁর গৃহিণীর বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তেমন ঝোঁক নেই।

মার্গারেট-ইউ হ্যাভ ভিজিটরস বলে একটা হাঁক দিয়ে সালডানহা আমাদের পাশের সোফায় বসে পড়লেন। আমাদের অবিশ্যি পরমুহূর্তেই দাঁড়াতে হল। কারণ ঘরে মিসেস সালড়ান্‌হা, অর্থাৎ মার্গারেট সুশীলা দেবী, এসে ঢুকেছেন।

ও–মিঃ মিত্র!

ভদ্রমহিলার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। তবে সে হাসি মুখ আলো করা হাসি নয়। কারণ হাসা সত্ত্বেও একটা অবসাদের ভাব মুখে থেকে গেল।

ফেলুদা বলল, বসুন, সুশীলা দেবী। আপনি বোধহয় জানেন না যে জয়ন্তবাবু কালকের চুরির ব্যাপারে আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন।

সেটা আজ সকালেই আন্দাজ করছিলাম।

সেই ব্যাপারেই আমি আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই। সালডানহা এই সময় উঠে পড়ে বললেন, আমি আপনাদের জন্য কফি বলছি, আর আমার পোশাকটা বদলে একটু মুখটা ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ আপনারা কথা বলুন।

সালডানহা চলে গেলেন ভিতরে।

সুশীলা দেবী বললেন, কী প্রশ্ন করবেন করুন।

আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?

আপনার একটি ছেলে আমেরিকায় আছে শুনলাম।

হ্যাঁ।

এ ছাড়া আর কোনও সন্তান আছে?

একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে কুলুতে থাকে। তার স্বামীর সেখানে অ্যাপল আচার্ড আছে।

আপনার ঘোনের চেয়ে আপনি কত বড়?

দু বছরের।

তার মানে আপনার প্রায় পিঠোপিঠি?

হ্যাঁ

আপনার বোনের প্রতি আপনার কীরকম মনোভাব ছিল?

একেবারে ছেলেবিয়সে আমরা দুজন ভীষণ বন্ধু ছিলাম। প্যামের আমাকে ছাড়া চলতই না। আমরা দুজনে একসঙ্গে পুতুল খেলতাম, নাসরি স্কুলে যেতাম, একরকম জামা কাপড় পারতাম।

তারপর?

আমার যখন বছর পনেরো বয়স তখন থেকেই আমি বুঝতে পারি যে মা-র টান আমার চেয়ে প্যামের উপর বেশি। তা ছাড়া প্যামের মধ্যে তখন থেকে অনেক গুণের প্রকাশ পেতে থাকে; ও খুব ভাল আবৃত্তি করত, অভিনয় করত, পড়াশুনায় আমার চেয়ে ভাল ছিল, দেখতেও আমার চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছিল। দেখলাম প্যামই মা-র আদবের হয়ে উঠছে। আমার উপরে ভালবাসা কমে যাচ্ছে! অবিশ্যি বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু মা-র ভালবাসা পেলাম না বলে আমার মনে একটা হিংসার ভাব জেগে ওঠে যেটা আমি তখন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সব শেষে মা যখন তাঁর হারটা প্যামকে দিয়ে দিলেন তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এ দুঃখ ভুলতে আমার অনেক সময় লেগেছে।

এখন মনে হিংসের ভাব নেই?

না। এক এক সময় ছেলেবেলার কথা মনে হলে জেলাস লাগে। কিন্তু এমনিতে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। কাল তো দেখলেন আমাদের—কী মনে হল?

দিব্যি সদ্ভাব।

শুধু তাই না। ওর সম্বন্ধে একটা অনুকম্পার ভাবও বোধ করি।

কেন বলুন তো?

কারণ আমার ভগ্নীপতি! তাঁর টাকার টানাটানি যাচ্ছে।

তাই বুঝি?

এটা কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি।

আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।

আমার ভগ্নীপতি অনেক দেনা করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্কিং বেড়ে গেছে।

কিন্তু কাল ওরকম পার্টি দিলেন?

কী করে দিলেন জানি না। আমি এবং আমার স্বামী নেমন্তন্ন পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

হয়তো এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তা হতে পারে। কিন্তু আমি দু মাস আগের কথাও জানি। আমার বান আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছে। তার উপর ওদের ছেলের গোলমাল তো আছেই। সে ব্যাপার এ৪৮ষেন্ (ডঠী ৎ শুনেছি।

আশা করি আপনার কথাই ঠিক—ওদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

হারটা কেচুরি করতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?

একেবারেই না। ওটা আমার কাছে একটা বিরাট রহস্য।

প্রসেনজিৎকে আপনার সন্দেহ হয় না?

প্রসেনজিৎ? ভদ্রমহিলা যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, একটা ব্যাপার আছে। ফিল্মটা যখন দেখানো হচ্ছিল তখন প্রসেনজিৎ আমার কাছেই ছিল। ফিল্ম চলা অবস্থায় সে উঠে কোথায় যেন যায়।

অন্য কোনও লোককে জায়গা বদলাতে দেখেছিলেন?

না। তা ছাড়া আমার দৃষ্টি পর্দার উপর ছিল। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখছিলাম ছবিটা।

থ্যাঙ্ক ইউ, সুশীলা দেবী—আমার প্রশ্ন শেষ। আমরা কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ির বাইরে এসে ফেলুদা বলল, এবার অ্যালবার্ট রতনলাল। তা হলেই আজকের মতো আমার কাজ শেষ।

সালডানহার বাড়ি থেকে আমরা রতনলালের ফ্ল্যাটে গেলাম। অত্যন্ত সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, আর একজনের পক্ষে বেশ বড়। ভদ্রলোক সোফায় বসে একটা হাই-ফাই স্টিরিওতে গজল শুনছিলেন, পরনে একটা বেগুনি ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। ভদ্রলোক যে আন্তর ব্যবহার করেন সেটা জানতাম না। ঘরে বেশ ঝাঁঝালো আতরের গন্ধ।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে স্টিরিওটা বন্ধ করে বললেন, কী ব্যাপার?

ফেলুদা বলল, কালকে চুরির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আমরা সকলকেই করেছি।

এভরিওয়ান?

শুধু মিঃ সুকিয়াসকে বাকি। সেটা কাল করব।

আপনার কি ধারণা আমি চুরিটা করে থাকতে পারি?

মোটেই না। তবে চোর ধরতে আপনি সাহায্য করতে পারেন।

আই অ্যাম নট ইন দ্য লিস্ট বিট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য থেফট।

এত দামি আর ভাল একটা জিনিস চুরি হল, আর তাতে আপনার ইন্টারেস্ট নেই?

মাইসোরের দেওয়া জিনিস তো দামি হবেই, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?

আপনার মা-র এত সাধের জিনিস ছিল!

আমার মা-র ফিল্ম কেরিয়ার সম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। আই থিংক অল ফিল্মস আর রটন। সাইলেন্ট ফিল্মস তো বটেই।

আপনার পেশাটা কী জানতে পারি?

তা পারেন। আমি একটা মার্কেনটাইল ফর্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

তা হলে আপনি আর কোনওরকমে সাহায্য করতে পারছেন না আমাদের?

আই অ্যাম ভেরি সরি। আমার কিছু বলার নেই।

একটা শেষ প্রশ্ন আছে।

কী?

কাল ফিল্মটা চলার সময় আপনি কাউকে জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন?

আমি তো ফিল্ম দেখছিলাম না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। আই স মিঃ সুকিয়াস কাম ইন।

ধন্যবাদ। আপনি দেখছি আপনার পিতামহের মতো হিন্দি গানের ভক্ত।

রতনলাল কোনও মন্তব্য না করে আবার স্টিরিওটা চালিয়ে দিলেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

৭. দিলখুশা

পরদিন সকালে ফেলুদা বলল, তোরা বরং দিলখুশাটা দেখে আয়। আমার একটু চিন্তা করার আছে, তা ছাড়া দু-একটা টেলিফোন করারও আছে। সুকিয়াসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেকেও একটা ফোন করব।

আমরা দুজনে আজ ট্যাক্সির বদলে একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরেলাম। লালমোহনবাবুর ভীষণ শাখ টাঙ্গা চড়ার কারণ উনি জানেন বাদশাহী আংটির সময় আমরা টাঙ্গা চড়েছিলাম।

টাঙ্গ রওনা হবার পর লালমোহনবাবু বললেন, দিলখুশার ইতিহাসটা একটু জেনে নিই।

আমি বললাম, দিলখুশা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নবাব সাদাত আলির তৈরি একটা বাগানবাড়ি ছিল। এর আশেপাশে হরিণ চরে বেড়াত। এখন শুধু ব্যাপারটার ভগ্নাবশেষ রয়েছে, তবে তার পাশে একটা সুন্দর পার্ক রয়েছে যেখানে লোকে বেড়াতে যায়। দিলখুশার উত্তরে বিখ্যাত লা মার্টিনিয়ার ইস্কুল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লড মার্টিনের তৈরি। মার্টিন ছিলেন মেজর জেনারেল। দিলখুশা থেকে এই স্কুলটা দেখতে পাবেন।

টাঙ্গাতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল—সত্যি, লখ্‌নৌ-এর মতো বাহারের শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। লালমোহনবাবু অবশ্য বার বারই বলছেন, ইতিহাস চোখের সামনের দেখতে পাচ্ছি।

দিলখুশার ভগ্নাবশেষ দেখতে বেশি সময় লাগে না। তাই আমরা সে কাজটা শেষ করে পার্কটায় একটু বেড়াতে গেলাম, আর সেখানে গিয়েই একটা বিশ্রী ঘটনায় আমাদের জড়িয়ে পড়তে হল।

প্রথমে মনে হয়েছিল পার্কে কোনও লোকজন নেই। লোক সচরাচর হয় বিকেলের দিকে। আমরা ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে খানিকদূর হাঁটার পর একটা গাছের পিছনে একটা

বেঞ্চির খানিকটা অংশ দেখলাম, আর সেই সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। গাছটা পেরোতেই যে দৃশ্যটা দেখলাম তাতে আমাদের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল।

দেখি কী, প্রসেনজিৎ আর দুটি তারই ধাঁচের ছেলে বেঞ্চিতে বসে কী যেন খাচ্ছে। তিনজনেরই চুল উসকো খুসকো আর চোখ ঘোলাটে। ওরা যে নেশা করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর এই নেশা বড় সহজ নেশা নয়। এ হল ড্রাগের ব্যাপার, যা খেয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হুঁশ হারিয়ে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এত মশগুল ছিল যে সে আমাদের প্রথমে দেখতেই পায়নি। তারপর যখন দেখল তখন তার মুখে এক অদ্ভুত ক্রুর হাসি ফুটে উঠল।

ডিটেকটিভের চেলাদের দেখছি, ডিটেকটিভ্ কোথায়? প্রশ্ন করল সে জড়ানো গলায়।

তিনি আসেননি, বললেন লালমোহনবাবু।

আহা, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন না।

আমরা চুপ।

চোর ধরা পড়ল? বিদ্রুপের সুরে প্রশ্ন করল প্রসেনজিৎ।

এখনও পড়েনি।

আমাকেই তো সকলে সন্দেহ করছে, তাই না? কারণ আমার টাকার অভাব। লোকের কাছে ধার চাইতে হয় ঘণ্টাখানেক স্বর্গবাসের জন্য। শুনুন-আই ক্যান টেল ইউ দিস-হার চুরি করার মতো বাকা আমি নই। আমার লাক্ খুলে গেছে। আমি বেশির ভাগ টাকা পাই জুয়া খেলে। মাঝে মাঝে লোকের কাছে ধার করতে হয়, কারণ এ জিনিস একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। আপনি ধরলে আপনিও আর ছাড়তে পারতেন না, মিস্টার থ্রিলার

রাইটার। একবার ট্রাই করে দেখুন না—আপনার লেখা অনেক ইমপ্রুভ করে যাবে। মাথার মধ্যে গল্পের প্লট ভিড় করে আসবে। কী, মিস্টার রাইটার—কী বলেন?

আমরা দুজনেই নির্বাক। এরকম একটা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে ভাবতেই পারিনি।

তবে একটা কথা বলে রাখি। —হঠাৎ তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে খসখসে ধারালো গলায় বলল প্রসেনজিৎ। তারপর তার জীনসের পকেট থেকে একটা ফ্রিক নাইফ বার করে খ্যাঁচ করে বোতাম টিপে ফলাটা বার করে সেটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে বলল, আজকের কথা যদি ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে তা হলে বুঝব সেটা আপনাদের কীর্তি। তখন বুঝবেন এই ছুরির ধার কত। নাউ ক্লিয়ার আউট ফ্রম হিয়ার!

বেগতিক ব্যাপার। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আর কোনও প্রয়োজনও নেই। যা দেখার তা দেখে নিয়েছি, আর এ দৃশ্য শুধু আমরাই দেখেছি, আর কেউ দেখেনি। আমরা দুজনে আবার টাঙ্গা করে হোটেলে ফিরে এলাম। সারা পথ দুজনের মুখে একটিও কথা নেই।

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের ঘরে শীলা বসে আছে, তার হাতে অটোগ্রাফ খাতা। আমাদের দেখে শীলা উঠে পড়ল। বলল, আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করে গেলাম। এনিওয়ে, সইয়ের জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ডিটেকশন সফল হবে।

শীলা চলে গেলে পর লালমোহনবাবুকেই বলতে দিলাম ফেলুদাকে দিলখুশার ঘটনাটা। ফেলুদা সব শুনে বলল, আমার ওর চোখের চাহনি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ও ড্রাগ ব্যবহার করে; ও ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

কিন্তু তা হলে ওই কি কণ্ঠহার চোর? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, ভাল কথা, আপনাদের আরেকবার একটু বেরোতে হবে।

হোয়াই স্যার?

সুকিয়াসের টেলিফোন খারাপ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। আমিই বেরোতাম, কিন্তু শীলা এসে পড়ল। ওঁর বাড়িতে গিয়ে অ্যাপায়েন্টমেন্ট করতে হবে। চট করে বেরিয়ে পড়লে এখনও ওঁকে বাড়িতে পাবার চান্স। আমার মাথায় একটা জিনিস দানা বাঁধছে। তাই আমি বেরোতে চাচ্ছি না। যা তোপ্‌সে, ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়।

লালমোহনবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, জেরা শুনতে শুনতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল, এবার তবু একটা কাজ পাওয়া গেল।

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সাত নম্বর লাটুশ রোড বলতেই ট্যাক্সি আমাদের সোজা। গন্তব্যস্থলে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিটাকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললাম।

বেশ বড় একতলা বাড়ি, গেটের গায়ে মার্কল ফলকে লেখা এস সুকিয়াস। গেট দিয়ে ঢুকে দুদিকে বাগান। তাতে ফুল নানা রকমের। বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ গাড়িবারান্দায় পৌঁছেছে। বাড়ির বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই।

আমরা কলিং বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ সুকিয়াস হ্যায়?

জি হাঁ হুজুর—আপকা সুভনাম?

জারা বোলিয়ে মিঃ মিটারকে পাস সে দো আদমি আয়ো হাঁয় এক মিনিট বাৎচিৎকে লিয়ে।

হিন্দিতে কটা ভুল হল জানি না, কিন্তু বেয়ারা ব্যাপারটা বুঝে নিল। আমাদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে সে ভিতরে চলে গেল।

এক মিনিট পরে যে বেয়ারা বেরিয়ে এল। তার চেহারাই পালটে গেছে। দৃষ্টি বিস্ফারিত, হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

কেয়া হুয়া? রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

আপলোগ... অন্দর আইয়ে... কোনওরকমে বলল বেয়ারা। আমরা বেয়ারার পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলাম। বেয়ারা সেইভাবেই কাঁপতে কাঁপতে বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল আমাদের।

ঘরটা হল যাকে বলে স্টাডি। চারিদিকে নানারকম শিল্পদ্রব্য আর বইয়ে ঠাসা আলমারি। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মিঃ সুকিয়াস, পরনে সাদা শার্ট, তার পিঠ রক্তে লাল। এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি কমই দেখেছি।

কী হরিবল ব্যাপার! বললেন লালমোহনবাবু। তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বললেন, তুমি শেষ কখন দেখেছ তোমার মনিবকে?

বেয়ারা আমতা আমতা করে যা বলল তাতে বুঝলাম মিঃ সুকিয়াস সকালে ব্রেকফাস্ট করে এই ঘরে চলে আসেন কাজ করতে। তিনি নিজেই সব করেন, তাঁর সেক্রেটারি নেই, বা বাড়িতে অন্য কোনও লোক নেই। বেয়ারা এই সময়টা প্রয়োজন না হলে তাঁকে ডিসটার্ব করে না। আজও সেই একই নিয়ম মানা হয়েছে।

সকলে কোনও লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বেয়ারা মাথা নাড়ল।

নেহি হুজুর। কোই নেহি আয়া।

আমি বুঝতেই পারছিলাম যে বাইরে থেকে সামনের দরজা দিয়ে লোক আসার কোনও দরকার নেই, কারণ সুকিয়াসের চেয়ারের পিছনেই হাট করে খোলা একটা জানালা, তাতে শিকা নেই। খুনি যে সেই জানালা দিয়েই ঢুকেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তোমাদের টেলিফোন তো খারাপ, তাই না? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

হাঁ হুজুর-দো রোজসে খারাপ হ্যায়।

কিন্তু–

আমি বললাম, পুলিশের কথা ভুলে গিয়ে চলুন ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে গিয়ে ফেলুদাকে নিয়ে আসি; যা করার ওই করবে।

তই চলো।

৮. ভুরু ভীষণ কুঁচকে গেছে

আমরা দশ মিনিটে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

ফেলুদাকে খবরটা দিতেই সে তার খাতাটা ফেলে দিয়ে কোনও কিছু না বলে জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার ভুরু ভীষণ কুঁচকে গেছে।

সুকিয়াসের বাড়ি পৌঁছে সে প্রথমেই বেয়ারকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ড্রাইভার আছে?

হ্যায় হুজুর, গাড়ি ভি হ্যায়।

ড্রাইভারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ড্রাইভার আসতে ফেলুদা তাকে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে বলল। ডুইভার চলে গেল।

এবার আমরা গিয়ে স্টাডিতে ঢুকলাম।

ছুরি মেরেছে ভদ্রলোককে, বলল ফেলুদা, অস্ত্রটা নিয়ে গেছে।

তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ভদ্রলোক চিঠি লিখছিলেন।

সেটা অবশ্য আমিও দেখেছিলাম। ইংরিজি চিঠির বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেছিল যখন ছুরিটা মারে।

এ কী–এ যে আমাকেই লেখা চিঠি? বলে উঠল ফেলুদা। তারপর বলল, যদিও পুলিশ আসার আগে এখানে কিছু নড়াচড় করা উচিত না, চিঠিটা যখন আমার তখন সেটার উপর আমার নিশ্চয়ই একটা ক্লেম আছে।

এই বলে ফেলুদা চিঠিটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করে পকেটে পুরে নিল।

তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখল। জানালার বাইরে একটা হাত চারেক চওড়া প্যাসেজ, তার পরেই বাড়ির পাঁচিল। সেই পাঁচিল টপকে লোক আসা খুব কঠিন নয়।

বোঝাই যাচ্ছে খুনটা কোনও ভদ্রলোক করেননি।

ফেলুদা প্রায় আপনমনেই কথাটা বলল। তারপর বলল, যতদূর মনে হয় এ হল লখ্‌নৌইয়া ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ। আর এখানে ডাকাতির কোনও প্রশ্ন আসছে না, কারণ এই একটা ঘরেই অন্তত লাখ টাকার জিনিস রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই শয়তানটিকে কিনি এমপ্লয় করেছিলেন। অর্থাৎ লোকটি কার অ্যাকমপ্লিস।

সেটা অবশ্য মিঃ সুকিয়াসের ব্যক্তিগত ইতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না, বললেন লালমোহনবাবু। তাই নয় কি?

ফেলুদা বলল, ভদ্রলোকের বিষয় যে আমরা একেবারেই কিছু জানি না তা নয়। অদ্ভুত লোক ছিলেন সেটা তো জানি। চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার সঙ্গে উঁচু দরের শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ গড়ে তোলা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নয়। আমার ধারণা চিঠিতেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

সেটা একবার পড়বেন না? লালমোহনবাবুজিজ্ঞেস করলেন।

চিঠিটার উপরে কনফিডেনশিয়াল লেখা ছিল সেটা বোধহয় আপনি দেখেননি। ওটা পড়ব যথাস্থানে যথা সময়ে। আততায়ীকে সুকিয়াস দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কাজেই তার আইডেনটিটি তো আর চিঠিতে থাকবে না।

দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। আবার ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। ফেলুদার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আপনি তো আমাদের টেক্কা দিয়েছেন দেখছি।

তা দিয়েছি, কিন্তু এখন থেকে এ কেসের ভার সম্পূর্ণ। আপনাদের উপর। আমি আর এতে নাক গলাতে চাই না, কারণ তাতে কোনও লাভ হবে না। শুধু আততায়ীকে ধরলে পরে আমাকে একটা খবর দেবেন।

আপনি তার মানে চললেন?

হ্যাঁ। তবে আপনার সঙ্গে হয়তো দু-এক'দিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে। কারণ আমি সেই চুরির মামলাটা মোটামুটি সলভ করে এনেছি।

বলেন কী!

তই তো মনে হচ্ছে।

আমরা কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের ছেলেকে সন্দেহ করছি। আপনিও কি তাই?

সেটা এখনও বলতে পারছি না। আমায় মাপ করবেন।

আমরা ডেফিনিট প্রুফ পেয়েছি ও ড্রাগসের খপ্পরে পড়েছে। ওর পিছনে একজন লোকও লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা।

ওয়েল, বেস্ট অফ লাক। এখন তো আপনাদের হাতে আরেকটি ক্রাইম পড়ল। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে। গুণ্ডা লাগিয়ে খুন। সবখানেই সম্ভব এবং সেটা লখ্নৌতেও সম্ভব বোধহয়।

খুব বেশি মাত্রায়।

থ্যাঙ্কস।

৯. অর্ধেক মামলার সমাধান

কোনও একটা মামলার মাঝখানে ফেলুদাকে এত নিষ্কর্মা হয়ে পড়তে দেখিনি কখনও। আমরা পর পর দুদিন লালমোহনবাবুকে নিয়ে লখ্‌নৌ শহর দেখিয়ে বেড়ালাম। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ফেলুদা, কী ব্যাপার বলে তো? তুমি এত চুপচাপ বসে আছ কেন?

ফেলুদা বলল, অর্ধেক মামলার সমাধান হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক পুলিশের সাহায্য ছাড়া হবে না। আমি এর মধ্যে পাণ্ডের কাছ থেকে দুবার ফোন পেয়েছি। মনে হয় পাকা খবর আর দুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।

পুলিশের ব্যাপারটা কি সুকিয়াসের খুনের সঙ্গে জড়িত?

ইয়েস, বলল ফেলুদা।

আর হার চুরি?

সেটা নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই।

আর সুকিয়াসের খুন সম্বন্ধে তোমার কি কোনও ধারণাই নেই?

আছে, কিন্তু প্রমাণ চাই? সেই প্রমাণটা পুলিশ গুণ্ডাটাকে ধরতে পারলেই পেয়ে যাব। কে খুন করিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।

আরও একটা দিন এই ভাবে কেটে গেল। আমরা জটায়ুকে নিয়ে মিউজিয়াম দেখিয়ে আনলাম। এখন জটায়ুর লখ্‌নৌ দেখা শেষ বললেই চলে। আমাদের কলকাতায় ফিরতে আর দুদিন বাকি আছে।

দুপুরবেলা ফেলুদা যে ফোনটা আশা করছিল সেটা এল। মিঃ পাণ্ডের কাছ থেকে। কথা বলার পর ওকে জিজ্ঞেস করতে ফেলুদা বলল, কেস খতম। ওরা গুণ্ডাটাকে ধরেছে। শম্ভু সিং বলে এক পাঞ্জাবি। সে আদালতে দোষ স্বীকার করেছে, আসল লোককে দেখিয়ে দেবে বলেছে। যে ছুরিটা দিয়ে খুনটা করা হয়েছিল সেটাও পাওয়া গেছে।

তা হলে এখন কী হবে?

রহস্য উদঘাটন। আজি সন্ধ্যা সাতটায় জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে।

এর পর ফেলুদাকে পর পর অনেকগুলো ফোন করতে হল। প্রথমে অবশ্য জয়ন্তবাবুকে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, বাকি সবাইকে তা হলে আপনিই খবর দিয়ে দিন। আপনি তো সকলের টেলিফোন নম্বরই জানেন।

ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌনে সাতটার সময় হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেও এসে পড়লেন সাতটার পাঁচ মিনিট আগে-সঙ্গে দুজন কনস্টেবল, আর আরেকটি লোক যার হাতে হাতকড়া। বুঝলাম সেই হচ্ছে খুনি গুণ্ডা।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে এসে পড়ল। সকলে বলতে তালিকাটা দিয়ে দিই—জয়ন্তবাবুর বাড়ির পাঁচজন, সাল্‌ডান্‌হার বাড়ির দুজন আর রতনলাল ব্যানার্জি। প্রশস্ত বৈঠকখানায় সকলে চেয়ার আর সোফাতে ছড়িয়ে বসলেন। রতনলাল আগেই প্রশ্ন করলেন, হোয়াট ইজ দিস ফার্স? ফেলুদা বলল, আপনি এটাকে প্রহসন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু আর সকলের কাছে ব্যাপারটা বোধহয় খুবই সিরিয়াস।

হারটা পাওয়া গেছে কি? চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন সুনীলা দেবী।

যথাসময়েই তার উত্তর পাবেন, বলল ফেলুদা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, রহস্যের সমাধান হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এটা

পুলিশের সাহায্য ছাড়া হত না। আমি আপনাদের এখন ঘটনাটা বলতে চাই। আশা করি আপনাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে তার জবাবও আমার কথায় পেয়ে যাবেন।

আই হাপ খুব বেশি সময় নেবেন না, বললেন রতনলাল ব্যানার্জি, আমার একটা ডিনার আছে।

যতটুকু দরকার তার এক মুহূর্ত বেশি নেব না, বলল ফেলুদা।

সবাই চুপ।

তা হলে এবার শুরু করি?

করুন, বললেন জয়ন্তবাবু।

গোড়াতেই বলে রাখি যে এখানে দুটো তদন্তের ব্যাপার নিয়ে আমাদের কারবার। এক হল শকুন্তলা দেবীর হার চুরি, আর দ্বিতীয় হল মিঃ সুকিয়াসের মার্ডার।

এই তদন্তের ব্যাপারে। আমি সকলকে জেরা করি। তার মধ্যে সকলেই যে সব সময় সত্যি কথা বলেছেন তা নয়। তাদের মিথ্যে কিছু ধরা পড়েছে অন্যের জেরাতে। কেউ কেউ কিছু কিছু জিনিস লুকোতে চেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আমার প্রশ্নের জবাবই দেননি। হারের ব্যাপারে অনেককে সন্দেহ করা চলতে পারত। তার মধ্যে ছিলেন শ্রীমান প্রসেনজিৎ, যিনি ভূগের নেশা ধরেছেন এবং সে ড্রাগ কেনার জন্য তাঁর প্রায়ই টাকার দরকার হয়। সে টাকা তিনি এর-ওর কাছ থেকে ধার করেন এবং জুয়া খেলেও জোগাড় করেন। তারপর আরেকজনকে সন্দেহ করা চলতে পারে; তিনি হলেন সুদর্শন সোম। পরের আশ্রিত তিনি, অভাবী লোক, হয়তো সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হারটা চুরি করেছিলেন। তা ছাড়া আছেন মিঃ সালডানহা। তাঁর দোকান ভাল চলছে না, তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হারটা চুরি করতে পারেন। এক জনের উপর সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না, তিনি হলেন জয়ন্তবাবু। কারণ তাঁর জবানিতে তিনি

বলেছিলেন যে তাঁর ব্যবসা ভালই চলছে, তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই। কিন্তু আরেকজনের জবানিতে আমি শুনি যে তাঁর ব্যবসা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, তিনি ফ্রাস্ট্রেশন বশত তাঁর মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি এই জবানি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না, এটা ভুলও হতে পারে।

এখানে সুকিয়াসের খুনের ব্যাপারে আমাকে আসতে হচ্ছে। তিনি যখন খুন হন তখন একটা চিঠি লিখছিলেন। চিঠিটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। এই চিঠি লেখার কারণ হল—তাঁকে হঠাৎ কানপুর চলে যেতে হচ্ছিল সেই সকালেই, তাই আমাকে তিনি কোয়েশ্চনিং-এর জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। কিন্তু কানপুর যাবার আগেই তিনি খুন হন।

এই চিঠি থেকে আমি দুটো তথ্য জানতে পারি। এক হল এই যে শকুন্তলা দেবীর হারটা অবশেষে জয়ন্তবাবু তাঁকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন দু লাখ টাকায়। এই হারটা আর তিনদিনের মধ্যেই সুকিয়াসের হস্তগত হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই হারটা চুরি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় তথ্য হল, এই ঘরে সমবেত সকলের মধ্যে একজন আছেন যিনি মিঃ সুকিয়াসের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করেন দেড় মাস আগে। তিনি বলেছিলেন টাকাটা এক মাসের মধ্যে সুদসমেত ফেরত দিয়ে দেবেন, কিন্তু দেননি। সুকিয়াস তাঁকে অনেক অনুরোধ করেও টাকাটা আদায় করতে পারেননি। তখন তিনি বলেন আইনের আশ্রয় নেবেন। এইসব তথ্য আমার জেরায় প্রকাশ পেয়ে যেত বলেই তাঁকে খুন করা হয়। অবিশ্যি যিনি খুনটা করিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সুকিয়াসের চিঠির কথা জানার কোনও উপায় ছিল না, কারণ খুনের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যিনি উপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ এই ভদ্রলোকের অ্যাকমপ্লিস, তাকে পুলিশ ধরেছে এবং সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। আর এটাও সে বলেছে যে, যে তাকে এমপ্লয় করেছিল তাকে সে দেখিয়ে দেবে।

ফেলুদা এবার পাণ্ডের দিকে ফিরল।

মিঃ পাণ্ডে–আপনি আপনার লোককে আনান তো।

দুজন কনস্টেবল গিয়ে শম্ভু সিংকে নিয়ে এল।

ফেলুদা বলল, তোমাকে যে খুনটা করতে বলেছিল। সে লোক কি এখানে রয়েছে?

শম্ভু সিং এদিক ওদিক দেখে বলল, হাঁ হুজুর।

তাকে দেখাতে পারবে? ওই যে সেই লোক, বলে একজন বিশেষ ব্যক্তির দিকে শম্ভু সিং তার হাতকড়া পরা দুটো হাত একসঙ্গে তুলে দেখাল।

সকলে অবাক হয়ে দেখল, যে রতনলাল ব্যানার্জির মুখ থেকে তাঁরা পাইপটা খসে ঠক্কাস শব্দে মাটিতে পড়ল।

হোয়াট ননসেন্স ইজ দিস? বলে উঠলেন রতনলাল ব্যানার্জি।

ফেলুদা বলল, আপনি ননসেন্সই বলুন, আর ফার্সই বলুন, ইয়োর গেম ইজ আপ, মিঃ ব্যানার্জি।

সমস্ত ঘরে একটা থমথমে ভাব, তার মধ্যে ফেলুদা কথা বলে চলল।

আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার অ্যালবার্ট রতনলাল ব্যানার্জি। আপনার কীসের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়েছিল সেটা বলবেন কি?

আই উইল নট, এখনও তেজের সঙ্গে বললেন রতনলাল।

তা হলে আমিই বলি, বলল ফেলুদা। আপনি যা রোজগার করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতেন। সুকিয়াস লিখেছে আপনি বাইজিদের পিছনে অঢেল টাকা ঢালতেন। আমরা যেদিন আপনার ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম। আমার

ধারণা আমরা আসার আগে আপনার ঘরে একজন বাইজি ছিলেন, তাঁকে আপনি ভিতরে পাঠিয়ে দেন। আপনি নিজে আতর ব্যবহার করলে পার্টির দিনেও নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু সেদিন কোনও গন্ধ পাইনি। আমার মনে হয়। আপনি আপনার পিতামহের স্বভাব পেয়েছিলেন। তাঁরও শেষ জীবনে অর্থাভাব হয়েছিল। আপনিও সেই একই কারণে সুকিয়াসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

ও মাই গড়। মাথা হেঁট করে রুদ্ধস্বরে বললেন রতনলাল। আই অ্যাম ফিনিশড।

ইনস্পেক্টর পাণ্ডে ও একজন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, আমার বক্তব্য অবিশ্যি এখনও শেষ হয়নি। এখনও একটা রহস্য উদঘাটন হতে বাকি আছে, সেটা হল শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার। সেটা জয়ন্তবাবু নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, কারণ সেটা তার আগেই অন্য একজনের হাতে যায়।

কার? চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুনীলা দেবী।

এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, বলল ফেলুদা। একটা ধারণা হয়েছিল যে সেদিন পার্টিতে যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছিল সেই অন্ধকার অবস্থাতেই বুঝি কেউ গিয়ে হারটা নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে ফিল্ম যখন চলে তখন পদার্থ থেকে প্রতিফলিত আলোয় ঘর আর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে না। আমি সেদিন প্রেজেক্টরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি শুধু পর্দাদার দিকে ছিল না। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চয় দেখতে পেতাম। কেউ বেরোয়নি। প্রসেনজিৎ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সোফায় বসে আর ছবি চলার মধ্যে সুকিয়াস প্রবেশ করেন। ঘরে আর কোনও নড়াচড়া হয়নি।

তা হলে? সুনীলা দেবী হতভম্ব।

তা হলে এই যে ছবি শুরু হবার আগেই হারটা সিন্দুক থেকে বার করে আনা হয়েছিল।

সে তো হয়েইছিল, বললেন সুনীলা দেবী। শীলা এনেছিল আপনাকে দেখানোর জন্য এবং শীলাই সেটা আবার তুলে রাখে।

না। সেখানেই ভুল। শীলা হারটাকে আর সিন্দুকে তোলেনি। সে সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কারণটা বুঝিনি। পরে রাত্রে সে সেটাকে একটা ফুলের টবে মাটির মধ্যে পুতে রাখে। এ কথা শীলা নিজে আমাকে বলেছে। এই যে সেই হার।

ফেলুদা তার কেটের পকেট থেকে হারটা বার করে ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখল। ঘরের সকলের মুখ থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

সুনীলা দেবী বললেন, কিন্তু...কিন্তু সে এরকম করল কেন?

কারণ সে তার ঘর থেকে আপনার এবং আপনার স্বামীর মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেছিল। তার শোবার ঘর তো আপনাদের শোবার ঘরের পাশেই এবং মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে। মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আপনি আপনার স্বামীকে বলছিলেন যে হারটা আপনি সুকিয়াসকে বিক্রি করতে রাজি আছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অবিশ্যি আপনার অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আপনি রাজি হয়েছিলেন সেটা তো ঠিক। এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই শীলা হারটা সরিয়ে রেখেছিল, এবং সে এটা করেছিল বলেই আজও হারটা আপনাদের কাছে রয়েছে এবং আশা করা যায় থাকবে। এমন জিনিস হাতছাড়া করাও একটা ক্রাইম।

*

হোটেলে ফিরে এসে লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, মশাই, লাক্‌নউ মানে তো ভাগ্য এখনই। তা এখানে ভাগ্যটা কার সেটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ফেলুদা বলল, কোন পারছেন না? ভাগ্য আপনার, কারণ আপনি আব্বার ফেলুমিত্তিরের একটা তারাবাজি দেখতে পেলেন বিনে পয়সায়।

আমি বললাম, তা ছাড়া সুনীলা দেবীদেরই ভাগ্য ভাল যে হারটা তাদেরই রয়ে গেল। থ্যাঙ্কস টুঁ মেরি শীলা।

যা বলেছ। তপেশ ভাই, বললেন লালমোহনবাবু।

শীলার মতো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না-তাই না ফেলুবাবু?

ফেলুদা বলল, শকুন্তলা দেবীর হারটা যদি সত্যি করে কেউ কদর করে, সে হল মেরি শীলা বিশ্বাস।